একজন ইসলামপন্থীর দৃষ্টিতে

ফরহাদ মজহার

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

একজন ইসলামপন্থীর দৃষ্টিতে ফরহাদ মজহার

একজন ইসলামপন্থীর দৃষ্টিতে

ফরহাদ মজহার

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
CSCS

একজন ইসলামপন্থীর দৃষ্টিতে ফরহাদ মজহার

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশক: সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
কার্যালয় (অস্থায়ী): এসই– ১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১।
০১৯৫৩ ৩২৩০৩০
contact@cscsbd.com
cscsbd.com

স্বত্ব: সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

মূল্য: ২৫০ টাকা মাত্র

'Ekjon Islamponthir Drishtite Farhad Mazhar' (Farhad Mazhar in the eyes of an Islamist) by Mohammad Mozammel Hoque, published in September 2022 by CSCS Publications, South Campus, University of Chittagong. BDT 250 only.

বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে যারা
চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক আন্দোলনে
অংশীদার হতে চায়
তাদের জন্য

সূচিপত্র

কেন এই সংকলন? অথবা, কেন আমি মজহারবাদী নই? ৯

ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর ১৫

ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পার্থক্য ২৯

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার ৩৯

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কি ইসলামের লক্ষ্য? ৪৫

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-২) ৫৭

চিন্তার প্যারাডাইম, প্যারাডাইমের পরিবর্তন ও চিন্তাগত উন্নয়ন প্রসঙ্গে কিছু প্রতিমন্তব্য ৭১

এরপরও কীভাবে ইসলামপন্থীরা মজহারবাদী হয়! ৮৩

নবুয়তকেন্দ্রিক সভ্যতার ধারণা প্রসঙ্গে মজহারীয় রাষ্ট্রচিন্তার অসঙ্গতি পর্যালোচনা ১০৯

সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে ফরহাদ মজহার ও আমাদের চিন্তার সংকট ১২৭

বৃটেনের ম্যানচেস্টারে প্রদত্ত ফরহাদ মজহারের বক্তব্য ১৩১

কেন এই সংকলন? অথবা, কেন আমি মজহারবাদী নই?

১.

আমি ইসলামপন্থী ঘরানা হতে উঠে আসা মানুষ। শ্রদ্ধেয় ফরহাদ মজহারের কথা শুনেছি অনেক পরে। তখন আওয়ামী লীগের অত্যাচারে ইসলামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশে ভীষণ কোণঠাসা। ফরহাদ মজহার একজন তাত্ত্বিক বামপন্থী হলেও কৌশলগত কারণে তখন জোরালো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন ডানপন্থী, বিশেষ করে ইসলামপন্থী দল, সংগঠন ও জোটগুলোকে। সঙ্গত কারণেই উনার এই অবস্থানকে তখন আমি খুব পছন্দ করতাম।

তিনি দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কলাম লিখতেন। সেগুলো আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়তাম। মুগ্ধতার সেই সময়েই আমি কীভাবে যেন বুঝতে পেরেছিলাম, ইনার মধ্যে সমস্যা আছে। আমার আশপাশের লোকদের দেখতাম, তারা সোৎসাহে প্রায়ই এমন ধরনের কথা বলতেন, 'ফরহাদ ভাই একদিন দ্বীনের পথে চলে আসবেন।' ফরহাদ মজহার নাকি তাদের 'দাওয়াতী টার্গেট'।

আমি তখন ঠাট্টা করে তাদের বলতাম, 'সময় বলে দিবে, কে কার 'টার্গেট'। আমার খুব খারাপ লাগতো, যখন দেখতাম, ইসলামী সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ের লোকজনও 'ফরহাদ ভাইয়ের' পাঠচক্রে বসে নিয়মিতভাবে মার্ক্স, হেগেল থেকে শুরু করে দেরিদা, লাকা, ফুকো, কত কিছু নিয়ে চিন্তাচর্চা করছেন, অথবা চিন্তা চিন্তা খেলছেন! দৃশ্যত জ্ঞানপিপাসু এসব শ্রদ্ধেয় জনেরা অথচ ফিলসফি কী তা তা-ই ঠিকমতো বুঝতেন না। এখনো বুঝেন কিনা, সন্দেহ।

ফিলসফি কী সেইটা না বুঝাইয়া, ফিলসফির ইতিহাসকে সংক্ষেপে হলেও ধারাবাহিকভাবে ফলো না করে মাঝখান থেকে মনমতো ফিলসফি পড়ানো শুরু

করে দেয়াটা একদৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা। অবশ্য কেউ যখন কারো শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তখন সে গুরুর চোখেই দুনিয়াটা দেখে। গুরু যা বলে তা চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়।

সে যাই হোক, সরকার বিরোধিতার সেই তুমুল সময়ে ফরহাদ মজহার লন্ডন সফরে গেলেন। ম্যানচেস্টার শহরে ডানপন্থী-ইসলামপন্থীদের একটা সমাবেশে তিনি বক্তব্য দিলেন। উনার সব বক্তব্যের মতোই ওই বক্তৃতাও ছিল বামপন্থী ন্যারেটিভনির্ভর একপেশে বয়ান। বলা যায়, আইডিওলজিকেলি ফুললি লোডেড। বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে পড়া আমার সেইসব কাছের লোকেরা এইবার আমাকে জেঁকে ধরলেন— ‘বলেন, ফরহাদ ভাইয়ের বক্তব্যের মধ্যে সমস্যা কোথায়?’

ফরহাদ মজহারের বিরুদ্ধে আমি লিখবো বা প্রকাশ্যে কিছু বলবো, এইটাতে আমি নিজেকে কিছুতেই প্রস্তুত করতে পারছিলাম না। অন্যদিকে আমার কাছের লোকজনের চাপ। ব্যাপারটা রীতিমতো আমার ইন্টিগ্রিটির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। অগত্যা আমি ‘সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্রে’র ছোটভাইদের বললাম, ‘তোমরা উনার এই বক্তৃতার অনুলিখন তৈরি করো।’ তারা সেটি প্রস্তুত করে আমাকে দিলো। আমার স্টাইলে আমি সেইটা ভালো করে পড়লাম। এরপর সেইটা হতে ফরহাদ মজহারের নিম্নে উল্লেখিত ৪টা প্রপজিশনকে আইডেন্টিফাই করলাম:

১. ইসলামের দুই ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। একটা ধর্মতাত্ত্বিক আর একটা দার্শনিক। দুইটাই সঠিক। উনি ইসলাম সম্পর্কে যা বলেন তা ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যা। ফিলসফিকেল ইন্টারপ্রিটেশান। তাই কোরআন, হাদীস আর ফেকাহর রেফারেন্সে ইসলাম সম্পর্কে উনার বক্তব্যে ভুল ধরা বা এ ব্যাপারে আপত্তি করার কিছু নাই।

২. ইসলাম ব্যক্তির চেয়ে সমাজকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়।

৩. মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য।

৪. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামের মূল লক্ষ্য।

আমার দৃষ্টিতে উনার এই চারটি ধারণাই ভুল। কেন আমি এগুলোকে ভুল মনে

করি তা ব্যাখ্যা করে আমি ৪টি প্রবন্ধ লিখলাম। সেগুলো সিএসসিএস-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো। নৈর্ব্যক্তিক করে লেখা হলেও মজহারপন্থী কাছের মানুষদের আমি জানালাম— 'নেন, এই তো লিখলাম আপনাদের ফরহাদ ভাইয়ের চিন্তার ক্রটি নির্দেশ করে। পড়েন।'

আল্লাহর কী মহিমা! উনাদের কেউ এগুলো একবারও পড়েছেন কিনা তা আমি পরবর্তীতে উনাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হতে বুঝতে পারিনি। ফরহাদ মজহারের প্রতি অনুরক্ত, একইসাথে আমারও শুভাকাঙ্ক্ষী, এমন লোকদের একজনও আমার সংশ্লিষ্ট লেখাগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বললেন না। এতে আমি খুব হতাশাবোধ করেছিলাম।

গুণীজন ও শ্রদ্ধেয় ফরহাদ মজহার নাকি কখনো কোথাও বলেছেন অথবা বলে থাকেন, আমার নিন্দুক আছে, সমালোচক কই? ব্যক্তিনিন্দা বলতে যা বোঝায় তা আমি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছি। কারো নিন্দা করাটা আমার অভ্যাসবিরোধী কাজ। আমার লেখাগুলো পড়লেই বুঝবেন, আমি উনার সমালোচনা করেছি বটে, কিন্তু কোথাও অশোভন কোনো মন্তব্য করি নাই। একজন একাডেমিক পারসন হিসেবে লেখাগুলোর মধ্যে আমি একটা একাডেমিক ধাঁচ বজায় রাখার চেষ্টা করেছি।

আমার জানা মতে, বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের মধ্যে আমিই প্রথম উনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছি। কথা বলেছি প্রকাশ্যে।

২.

প্রায় তিন দশক আমি ট্রাডিশনাল ইসলামিক মুভমেন্ট বলতে যা বোঝায়, সেই ধারার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। পরবর্তীতে দেখলাম তাদের দাবিকৃত আদর্শ আর অনুসৃত কর্মনীতির মধ্যে এতটাই ফারাক যে তা কোনোক্রমে পূরণযোগ্য নয়। বুঝলাম, জামায়াতের সংস্কার — তারিক রমাদানের ভাষায়, ট্রান্সফর্মেটিভ রিফর্ম — অসম্ভব-প্রায়। তাই ২০১০ সালের পর থেকে আমি ক্রমান্বয়ে সরে আসি।

আমার প্রায় সাত শতাধিক লেখার মধ্যে পঞ্চাশটির মতো জামায়াতকে নিয়ে। 'জামায়াতে ইসলামী: অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন' শিরোনামে সেগুলোকে সংকলন করেছি। আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে (mozammelhq.com) এর সফট কপি পাবেন।

এতকিছুর পরেও জামায়াত-শিবিরের ভিতর-বাইরের অনেকেই আমাকে জামায়াতের সংস্কারবাদী হিসেবে বলতে থাকেন। এর প্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা সিরিজ লেখা লিখেছিলাম 'কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই' শিরোনামে। এর ২য় পর্ব ছিল ফরহাদ মজহারকে নিয়ে।

সেখানে আমি লিখেছি, জামায়াতের লোকেরা, বিশেষ করে 'রিফর্ম ফ্রম উইদিন' ফর্মুলাতে বিশ্বাসীরা কমবেশি ফরহাদ মজহারের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। আমি কখনোই রিফর্ম ফ্রম উইদিনে বিশ্বাসী ছিলাম না। তাই আমাকে জামায়াতের সংস্কারবাদী বলাটা অনুচিত। সেই লেখাটাও এখানে পাবেন। পড়তে পারেন।

চিন্তার প্যারাডাইম, প্যারাডাইম শিফট ও চিন্তাগত উন্নয়ন নিয়ে ২০১৬ সালের দিকে আমি একটা লেখা লিখেছি, যেখানে ফরহাদ মজহারের প্রসঙ্গ এসেছে। সেটাও এখানে দিয়েছি। পড়তে পারবেন।

ফরহাদ মজহার নিয়ে আমার লেখালেখির সূত্র ধরে তরুণ গবেষক শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকী ইসলামপন্থীদের দৃষ্টিকোণ হতে ফরহাদ মজহারের চিন্তার সংকট নিয়ে একটা চমৎকার লেখা প্রকাশ করেন। তৎকালীন সময়ে একটা লম্বা ভূমিকাসহ আমি সেটি ফেইসবুকে শেয়ার করেছিলাম এবং ওই লেখার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াকেন্দ্রিক আলোচনায় অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম।

মূল লেখাটা শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকীর হলেও আমার ফরোয়ার্ডিং এবং এর সূত্রধরে আলোচ্য বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে ব্যাপক এনগেইজমেন্টের কারণে শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকীর লেখাটিসহ পুরো লেখাটাকে এখানে সংকলন করেছি।

নবুয়ত ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে ইসলামী ধ্যানধারণার সাথে ফরহাদ মজহারের চিন্তার পার্থক্য তুলে ধরে আমি ছোট কলেবরের দুটি লেখা লিখেছিলাম। সেগুলোকেও এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

৩.

শিরোনামে যেমনটা দেখেছেন, এই সংকলনটা 'কেন আমি মজহারবাদী নই' তা বলার জন্য; শ্রদ্ধেয় ফরহাদ মজহারের চিন্তাকে বিশ্লেষণ করার জন্য নয়। সত্যি কথা হলো, আগাগোড়া ভালো করে পড়া বলতে যা বোঝায় আমি উনার কোনো বই সেইভাবে পড়ি নাই। তেমন কোনো আগ্রহও আমার নাই।

মজহার পাঠের ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ না থাকার কারণ হিসেবে এখানে একটা কথা বলা দরকার বলে মনে করিছি।

দুনিয়ার কোথায় কোথায় কী কী ভালো জিনিস আছে, অথবা কার কার কোন কোন বিষয়ে কোথায় কোথায় ভুল আছে, তা খুঁজতে থাকার আকুতি কিছু লোকের মধ্যে দেখা যায়। উনারা মনে করেন, এটি বুদ্ধিজীবিতার পূর্বশর্ত। অথচ, এটি ভুল। এ ধরনের লক্ষ্যহীন জ্ঞানচর্চা, বিশেষ করে এ ধরনের সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ তথা নেগেটিভ এপ্রোচকে জ্ঞানতত্ত্বের ভাষায় pyrrhonism বলা হয়। সঠিক পথের নির্দেশনা পাওয়ার এটি ভুল পদ্ধতি।

সংশয়বাদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানার জন্য আমার একাডেমিক সাইট dorshon.com হতে 'পদ্ধতি হিসেবে সংশয়বাদ বনাম পরিণতি হিসেবে সংশয়বাদ' শিরোনামের আর্টিকেলটা পড়ে দেখতে পারেন। তাই পিরোনিজম নিয়ে এখানে আর কথা বাড়াচ্ছি না।

সমকালীন বাংলাদেশের আর দশজন প্রমিনেন্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর মতো ফরহাদ মজহার একজন প্রথিতযশা বামপন্থী বুদ্ধিজীবী। বামপন্থা সম্পর্কে যা জানা জরুরি বলে মনে করেছি, তরুণ বয়সেই তা জেনেছি। তাই আলাদাভাবে ফরহাদ পাঠের অত্যাবশ্যকীয়তা আমি বোধ করি না। কিন্তু কেউ বললে শুনি। পক্ষ-বিপক্ষ নানা কথাবার্তার মাধ্যমে ঋদ্ধ হই। এটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সত্য কথা হলো তা যার মধ্যে কোনো মিথ্যা নাই। এর বিপরীতে, মিথ্যা কথা হলো তা যার মধ্যে অনেকখানি সত্য কথা আছে। সাথে অবধারিতভাবেই আছে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মিথ্যা বা বোগাস ইনফরমেশন এন্ড প্রপজিশন। তাই যাদের চিন্তাভাবনা মোটাদাগে ভুল তাদের কথাবার্তার মধ্যেও অনেক সঠিক জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়।

অনেক সময়ে এমন হয়ে থাকে, যা কিছুর দোহাই দেয়া হচ্ছে, তা সঠিক। কিন্তু উত্থাপিত প্রেমিজগুলো হতে যে কনক্লুশান টানা হচ্ছে, তা ভুল।

৪.

লেবু অতিরিক্ত চিপলে তিতা বের হওয়ার মতো জামায়াতের সংস্কার আর ফরহাদ মজহার, এই দুইটা আমার কাছে এখন রীতিমতো বিরক্তিকর প্রসঙ্গ।

এসব নিয়ে পড়ে থাকাকে আমি ময়দানবিমুখতার লক্ষণ বলে মনে করি।

জামায়াত জামায়াতের জায়গায় আছে। থাকবে। ফরহাদ মজহার উনার মতো এক্টিভিজম করছেন। দ্যাটস ফাইন। ভালোমন্দ কন্ট্রিবিউশান উনি যা করেছেন, তা আছে। থাকবে। বাংলাদেশে ইসলামিক প্যারাডাইম হতে কিছু করতে গেলে জামায়াত আর ফরহাদ মজহারকে পক্ষ বা বিপক্ষ ধরে আগাইতে হবে, আমি এটি জরুরি বলে মনে করি না।

শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণযোগ্য মনে করা সত্ত্বেও কেন আমি ফরহাদ মজহারের বিরোধিতা করি, তা নিয়ে সেদিন এক তরুণ বুদ্ধিজীবী জানতে চাইলেন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় উনাকে আমি তা ব্যাখ্যা করে বলেছি। ওয়াদা করেছি, ফরহাদ মজহার নিয়ে আমার লেখাগুলো প্রিন্ট করে ওর কাছে পাঠাবো।

এরপর সেন্টারে এসে মাসউদুল আলমকে বললাম, ফরহাদ মজহার নিয়ে আমার লেখাগুলো একত্রিত করো। অমুককে দিতে হবে। মাসুদ লেখাগুলো কম্পাইল করে দেয়ার পরে মনে হলো এগুলো গ্রন্থিত করে রাখলে মন্দ হয় না। সেই সুবাদে এই সংকলন।

আমাদের সব বইয়ের মতো এই বইটারও সফট কপি আমাদের ওয়েবসাইট হতে ফ্রিতে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

আপাতত শেষ কথা হলো, নিজের স্বাধীন চিন্তা আর বিবেক বুদ্ধিকে বিসর্জন না দিয়ে আসুন আপন আলোয় পথ চলি। সর্বাবস্থায় নিজের ব্যক্তিত্ব আর স্বাতন্ত্র্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে একজন অগ্রণী সমাজকর্মী হিসেবে কর্মতৎপর থাকি।

ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর

ভূমিকা

ইসলাম আসলে কী? অথবা, প্রচলিত অর্থে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিকল্প হিসেবে ইসলামের কি আলাদা কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে? হলে সমস্যা কী? তাহলে কি 'ইসলামী দর্শন' কথাটা আদতে ভুল? তাই যদি হয়, এতো এতো মুসলিম দার্শনিকরাই বা কী করেছেন? ইমাম গাজ্জালী বা আল্লামা ইকবালের 'ইসলামী দর্শন' কি প্রমিন্যান্ট দর্শন হিসেবে স্বীকৃত নয়? এসব প্রশ্নের 'ইঙ্গিতমূলক' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত উত্তর নিয়েই এই নিবন্ধ।

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ আসলে ইসলামের প্রচলিত ব্যাখ্যাপদ্ধতি কী— তা নির্ণয় করাও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবে। ইসলামকে জানা-বুঝা ও এর ব্যাখ্যা-ভাষ্য রচনার প্রচলিত পদ্ধতিটা হচ্ছে ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি। আমরা জানি, কোনো ধর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মগুরুর সিদ্ধান্তের প্রতীয়মান অর্থ অনুসারে ধর্মের নানা বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া ও ভাষ্য রচনার যে পদ্ধতি, তা-ই হলো ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি। ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে এবং ধর্মবেত্তাগণ তা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মূলগত দিকটা অক্ষুণ্ন রেখেই ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্য তৈরি হয়।

ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত, প্রচলিত এবং প্রায়শই আক্ষরিক অর্থের বাইরে ধর্মের বিষয়সমূহকে (notions or issues) যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করাকে ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সোজা কথায়, ধর্মের বিষয়গুলো নিয়ে দর্শনচর্চা বা ধর্মকে দর্শনের আলোকে দেখাই হচ্ছে ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যাপদ্ধতি।

ব্যাপারটা তাহলে দর্শনের সংজ্ঞায় এসে ঠেকলো। তাই না? মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবীর তাবৎ দার্শনিকরা একমত হয়েছেন, দর্শনের এমন কোনো সংজ্ঞা নাই। বলা যায়, দার্শনিকরা (দার্শনিক হিসেবে) যা করেন, যেভাবে করেন, তা-ই দর্শন! এক একজন দার্শনিক দর্শনের এক একটি দিকের উপর গুরুত্বারোপ করে দর্শনের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সেসব বিতর্কে না গিয়ে দর্শনের লক্ষণগত একটা সংজ্ঞা বা পরিচয় এভাবে হতে পারে: কোনো মৌলিক বিষয়ের তত্ত্বগত দিকসমূহকে যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করা। অন্য কথায়, যে কোনো প্রশ্নকে গ্রহণ করা ও তাত্ত্বিক যুক্তি (logical argument) দিয়ে নিজের কথা তুলে ধরা।

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বাইরে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যা হতে পারে কিনা— এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। আমার মতে, ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক দু'ধরনের ব্যাখ্যাই হতে পারে। ইসলামের দিক থেকেও তা হতে পারে, ইসলামের বাইরের দিক থেকেও তা হতে পারে। ইসলামের ভেতর থেকে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার অনুমোদন থাকার মানে হলো– ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর পক্ষে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিগুলো কী, তা আলোচনা করা। যেমন: তাওহীদ, রেসালাত, আখেরাত ইত্যাদির পেছনে কী ধরনের দার্শনিক যুক্তি রয়েছে, তা আলোচনা করা। এক্ষেত্রে দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পরস্পর পরিপূরক (complementary) হিসেবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ হিসেবে ইমাম গাজ্জালীর 'তাহাফাতুল ফালাসিফা'র কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর বিবেচনায়, তৎকালীন মুসলিম দার্শনিকদের গৃহীত 'ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক' ২০টি অনুসিদ্ধান্তকে তিনি দার্শনিক যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। ধর্মের বিষয়গুলোকে নিছক ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণের প্রচলিত পদ্ধতির (ফকীহদের পদ্ধতি) পরিবর্তে দার্শনিকদের প্রমাণ-পদ্ধতিতেই তিনি ইসলামের মূল বিষয়গুলোর সমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন। এমন নয় যে, এতে তিনি কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দেন নাই। কোরআন-হাদীসের রেফারেন্স উভয় পদ্ধতিতেই ব্যবহৃত হয়। তফাৎ হলো, ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তা 'দোহাই' বা অবশ্য-মান্য হিসেবে আসে, আর দার্শনিক পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট রেফারেন্সের গুরুত্ব অনুসারে তা 'যুক্তি' হিসেবে আসে। ইমাম গাজ্জালী নিজেকে কখনো দার্শনিক ভাবেন নাই। বইয়ের নামই দিয়েছেন, 'দর্শনের খণ্ডন'! অতএব, বুঝা গেলো, কোনো কিছু দর্শন হয়ে ওঠা সেটির উপস্থাপনা-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। ইমাম গাজ্জালীর দর্শন এই অর্থে একটি যথার্থ দর্শন। অতএব, ইসলামী দর্শন বা এর দার্শনিক ব্যাখ্যা আলোচ্য অর্থে সম্ভবপর এবং তা ইসলামের দিকে থেকে

গ্রহণযোগ্যও বটে। বরং বলা যায়, ইসলামী দর্শন ইসলামের একটি অপরিহার্য দিক।

সমস্যা হলো ইসলামী ধর্মতত্ত্বের আওতাবহির্ভূত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 'দার্শনিক ব্যাখ্যা'র গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। ধরা যাক, এ রকম একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা-পদ্ধতিতে ইসলামকে অর্থাৎ ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করা হলো। যেহেতু এটা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দর্শন চর্চা, তাই এটি এক অর্থে ইসলামী দর্শনও বটে। ইসলামকে যিনি সমর্থন করেন তাকেও ইসলামিস্ট বলা যায়। আবার ইসলামকে যিনি ইসলামের ভেতরকার দিক থেকে মানেন না বা সমর্থন করেন না; কিন্তু ইসলাম নিয়ে কাজ করেন তিনিও নিজেকে ইসলামিস্ট দাবি করতে পারেন। অতএব, ইসলাম নিয়ে চর্চিত দর্শনমাত্রই ইসলামী দর্শন, হোক তা ইসলামকে সমর্থন করে কিংবা তা না করে। ইসলামকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করে এর কোনো বিশেষ বিষয়কে (notion অর্থে) গ্রহণ করে বা তাকে ভিত্তি ধরেও দর্শন চর্চা হতে পারে। ইসলামকে locate করার সুনির্দিষ্ট বা অনতিক্রম্য (specific or predefined) কোনো 'ইসলামী' পদ্ধতি আছে কিনা এবং সেখানে কোন ধরনের দার্শনিক পদ্ধতির স্থান কী রকম– তা নিরূপণ করাই এই আলোচনার মূল বিষয়।

ইসলাম নিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দর্শন চর্চার সমস্যা

আমরা জানি, ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ববাদ (unicity of God)। তাওহীদের ধারণা স্রষ্টার অস্তিত্ব, এককত্ব এবং তাঁর সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে ইসলাম-এর মৌলিক বিষয়গুলো যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যায় তা যদি বাহ্যিক ও মর্মগত দিক থেকে হুবহু স্বীকার ও প্রত্যয়ন করা না হয় তাহলে দু'ধরনের সমস্যা হতে পারে:

১। ধর্মতাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত অর্থের বিপরীত অর্থ সাব্যস্ত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সরাসরি অস্বীকার করার নামান্তর বা কুফর।

২। এমন ব্যাখ্যা হতে পারে, যা দৃশ্যত ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাথে বিপরীত না হলেও শেষ পর্যন্ত তা ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক। যুক্তি-পদ্ধতির যেমন নানা রকম মান ও মাত্রা রয়েছে; কোনো বিষয়ের উপর উপস্থাপিত

যুক্তিও নানা রকম মান ও মাত্রার হতে পারে। সামগ্রিকভাবে না দেখলে এবং প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা না থাকলে একই বিষয়ের বিপরীতমুখী ফলাফল হতে পারে। '১০-এর মান কত?' এটি কোনো প্রশ্নই নয়। কারণ, কত দিয়ে কী (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) করা হচ্ছে, তা পূর্বেই নির্ধারণ না করলে ১০-এর ভিত্তিতে বহু রকমের ফলাফল হতে পারে।

আরেকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মনে করুন, কেউ যুক্তি দিয়ে বললো— যেহেতু আল্লাহ বলেছেন তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল, অতএব আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মানুষকে তিনি দোযখে দিতে পারেন না। স্থায়ীভাবে দোযখে জ্বালানোর কথাগুলো মূলত রেটরিক। নিছক ভয় দেখানোর জন্য সেগুলো বলা হয়েছে! এহেন যুক্তি বা যুক্তিধারা দর্শনসম্মত হলেও ইসলামসম্মত নয়। আমরা জানি— নামায, রোযা, হজ, যাকাত, হুদুদ ইত্যাদিসহ ইসলামী শরীয়াহর প্রতিটি বিষয়ের পেছনে কোনো না কোনো যুক্তি, উদ্দেশ্য বা মর্মার্থ রয়েছে, যা মানুষ চিন্তা করলে বুঝতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) সেসব কারণ বা যুক্তির কথা উল্লেখও করেছেন। যেমন: নামাযের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটি মানুষকে অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এখন এই আয়াতকে ভিত্তি ধরলে যিনি অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করেন, দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার জন্য নামায পড়ার বাধ্যবাধকতা বহাল থাকে না। অথচ, নামায-রোযাসহ সকল ইবাদতের বিষয় এ জন্যই ফরয যে আল্লাহ তা হুকুম করেছেন। যুক্তির সমর্থন বা উদ্দেশ্যের বিষয়গুলো পরিপূরক মাত্র। অতএব, ইবাদতের বিষয়গুলোকে মূলত 'আল্লাহর হুকুম, তাই মান্য'– এভাবে গ্রহণ করা না হলে ইসলামের দিক থেকে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ভাষ্য তৈরির বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য

ইসলামের দিক থেকে ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সদাসর্বদা কি অভিন্ন? না, তা নয়। তাহলে ইসলামসম্মত দার্শনিক ব্যাখ্যার সাথে আলোচ্য ইসলাম কর্তৃক অসমর্থিত দার্শনিক ব্যাখ্যা-ভাষ্যদান পদ্ধতির ফারাকটা কোথায়? ব্যাখ্যা-ধারার বৈপরীত্য অর্থে ভিন্নতা (contradiction in interpretation) এবং বৈচিত্র্য অর্থে ভিন্নতার (plurality in interpretation) মধ্যে এই ফারাক নিহিত। বৈপরিত্য এক প্রকারের ভিন্নতা, আবার ভিন্নতাকেও এক অর্থে বৈপরীত্য বলা যায়। তবে এখানে ভিন্নতা ও বৈপরীত্যকে আমরা আলাদা করেই

বুঝবো। একই পথের ডান পাশ, বাম পাশ ও মাঝখান বরাবর চলা– এই তিন ধরনের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, বৈপরিত্য নেই। একটি নির্দিষ্ট ধারার ব্যাখ্যা পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য অর্থে ভিন্নতা হতেই পারে। উল্টোভাবে, ভিন্ন আঙ্গিক বা ভিন্ন যুক্তিতে ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। এসবই হলো ইসলামের মধ্যে দার্শনিকতার ক্ষেত্র বা অবকাশ (scope of philosophy in Islam)। দার্শনিকতার অবকাশ থাকা মানে দর্শন চর্চার ইতিবাচক সম্ভাবনা। আবার ইসলাম 'অনুমোদিত' অবকাশকে অতিক্রম করে মুক্তভাবে দর্শন চর্চাও এক প্রকারের ইসলামী দর্শন চর্চা। এই উভয় প্রকারের দর্শন চর্চার পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক ও স্বচ্ছ ধারণা ব্যতিরেকে ইসলামী দর্শনের ক্ষেত্র, সম্ভাবনা ও সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

দর্শন ও ডগমার ডিলেমা

এখানে স্বয়ং দর্শন সম্পর্কেই অধিকতর মৌলিক একটি প্রশ্ন এসে পড়ে। ইসলাম প্রসঙ্গে হোক বা অন্য কোনো বিষয়েই হোক, কোনো ধরনের আপ্তবাক্যকে (dogma) অলংঘনীয় বা 'মৌলিক বিষয়' হিসেবে অক্ষুণ্ন রাখার শর্ত চাপিয়ে দিয়ে, সোজা কথায় চিন্তার সীমারেখা টেনে দিয়ে যুক্তি চর্চার নামে যা হবে, তা কি আদৌ দর্শন হবে? আপাতদৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত জটিল ও অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন। বিশেষ করে, যারা দর্শনকে দর্শনের ভেতর থেকে দেখেননি তাদের কাছে এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন।

আচ্ছা, দর্শনে এমন কোনো তত্ত্ব, মতবাদ, যুক্তিধারা বা এমন কোনো দার্শনিক চিন্তাধারা আদৌ কি আছে বা হতে পারে, যা কোনো না কোনো পূর্বানুমানকে (pre-supposition) অবলম্বন করে সেটিকে বা সেগুলোকে স্বয়ং-সঠিক (self-justified) হিসেবে গণ্য না করে দাঁড়িয়েছে? এর উত্তর হ্যাঁ-সূচক হলে সেই তত্ত্বটির নাম কি? আদতে এ রকম তত্ত্ব বা এ জাতীয় কিছু নাই। কিছু বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েই কোনো বিষয়কে যাচাই করতে হয়। বলা যায়, কোনো না কোনো 'উত্তর'কে ইতোমধ্যে বা যে কোনো প্রকারে গ্রহণ করে নিয়েই ওই বিষয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন করতে হবে। Every question does have some 'answers' and every answer does have some questions। এই যে ধরে নেয়া, দর্শনের ভাষায় এটাকে বলা হয় নির্বিচারবাদ (dogmatism)। নির্বিচারবাদের বিরুদ্ধে দর্শন, আবার দর্শনই কিছু নির্বিচারের উপর নির্ভর করে। আশ্চর্যের ব্যাপার! তাই না? আসুন এ বিষয়কে একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করি।

জ্ঞানের উৎস সংক্রান্ত মতবাদগুলোর অন্যতম প্রধান দুটি হচ্ছে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ। মূলধারার (পাশ্চাত্য) দর্শনে এ দুটিই মূলত নির্বিচারবাদ (dogmatism)। কেউ বুদ্ধিকে জ্ঞানলাভের অধিকতর গ্রহণযোগ্য উৎস হিসেবে মনে করলে তিনি বুদ্ধিবাদী। আর কেউ পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে আগত অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের মূল বা প্রাথমিক উৎস গণ্য করলে তিনি অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক গণ্য হবেন। বুদ্ধিবাদ কীভাবে নির্বিচারবাদী হয়? জ্ঞানের উৎস সন্ধান বা যাত্রাপথেই যদি 'ধরে নেয়া' হয় যে, বুদ্ধিই জ্ঞানের প্রকৃত বা একমাত্র উৎস; তাহলে তা পথ চলার শুরুতেই গন্তব্যের মূল্যায়ন শেষ করার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একই সমস্যা বা অভিযোগ অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ধারায় আলোচনা করলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এক এক করে সাপ বেরুবে।

তাহলে দর্শনটাই কি সামগ্রিক ও অন্তর্গতভাবে নির্বিচারবাদী!? অথচ আমরা জানি, নির্বিচারবাদ এবং দর্শন— উভয়ই পরস্পরকে খণ্ডন করে। ব্যাপার হলো, দর্শনের কোনো চিন্তাপদ্ধতিই আদতে (in its fundamental level) নির্বিচারবাদমুক্ত (non-dogmatic) নয়। বলা যায়, দর্শনের ভিতরকার এই স্ববিরোধী পরিস্থিতিই মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক নিয়তি (epistemic predicament)। কোনো মাপকাঠির (scale) মাপকাঠি হওয়ার জন্য কোনো আদর্শ মাপ (standard measurement) না থাকা সত্ত্বেও 'মাপকাঠি' মাপকাঠি হয়েছে। হওয়াটা ঠিকই হয়েছে। 'ধরে নেয়া' ধ্রুবক দিয়েই আমরা যাচাই বা পরীক্ষা করি, অন্তত শুরুর দিকটা তা-ই। ধ্রুবক বা স্বতঃসিদ্ধ, সোজা কথায়, মাপকাঠি সম্পর্কে 'কেন?' জাতীয় কোনো প্রশ্ন চলে না। এ ধরনের সার্বজনীন ও মানবিক চিন্তাপদ্ধতির কারণেই জ্ঞান-গবেষণা সম্ভবপর হয়েছে। এই ধরনের চিন্তাধারার ছাঁচে ফেলেই 'স্বেচ্ছাচারিতা'কে 'স্বাধীনতা'র ধারণা হতে আলাদা করে বিবেচনা করা সম্ভব। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা মানেই কোনো না কোনো বিশেষ আঙ্গিকে চর্চা। স্বাধীন মানেই কোনো না কোনো সীমাবদ্ধ জাতীয় 'কিছুর' প্রেক্ষিতে স্বাধীন।

দর্শন, দার্শনিকতা ও দার্শনিক

দর্শন কোনো বিষয়েই একপাক্ষিক (biased) বা চূড়ান্ত (conclusive) কোনো কথা বলে না। যেমন, খোদার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে দার্শনিক যুক্তি চার রকমের (category) হতে পারে:

১। মানুষ ও জগতের স্রষ্টা 'আছে' বলে যারা মনে করেন তাদের মতটি হলো—

আস্তিকতা (theism)।

২। স্রষ্টা 'নাই' যারা মনে করেন তাদের মতটি হলো— নাস্তিকতা (atheism)।

৩। মানুষ ও জগতের একজন বা একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকতেও পারে, নাও থাকতেও পারে; এখনো নিশ্চিত নন বা কখনোই নিশ্চিতযোগ্য নয়, তবে বিষয়টিকে একটি বিবেচ্য বিষয় হিসেবে যারা মনে করেন তাদের মত বা অবস্থানকে বলা যায়— অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism)।

৪। অপরদিকে মানুষ ও জগতের স্রষ্টা থাকা কিংবা না থাকা সংক্রান্ত পুরো বিতর্ক ও বিষয়টিকে যারা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন তাদেরকে আমরা নির্বিকারবাদের (irrelevantism) ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করতে পারি।

অজ্ঞেয়বাদের সাথে নির্বিকারবাদের পার্থক্য হলো, অজ্ঞেয়বাদ বিষয়টিকে (issue) স্বীকার করে (to take in cognizance)। সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদের এই অবস্থানটা হলো 'not yet' ধরনের। খোদার অস্তিত্ব প্রশ্নে এ চারটি অবস্থা বা অবস্থান কিংবা মতের সব কয়টিই দর্শন-এর অবস্থান, মত বা তত্ত্ব। এগুলোর আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে ব্যক্তিবিশেষের একটি অবস্থান শেষ পর্যন্ত উঠে আসে। সেটি হতে পারে আস্তিকতা, নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ কিংবা নির্বিকারবাদ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে কেউ এই সবগুলো তত্ত্বই পড়বেন। তা সত্ত্বেও, দর্শন চর্চাকারী ব্যক্তি তথা একজন দার্শনিকের অবস্থান সব সময়ই কোনো না কোনো একটি মতের পক্ষে থাকে, যেটিকে তিনি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। এমনকি জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে মাঝামাঝি বা নিরপেক্ষ অবস্থানও একটি পক্ষ, সাধারণ ভাষায় যাকে আমরা abstain করা বলি। রেফারি টাইপের কারো জন্য সেটিই সর্বাধিক যুক্তিসম্মত অবস্থান হতে পারে। এ ধরনের চিন্তার সূত্রে IBE'র (Inference to the best explanation) মতো 'মৌলিক সূত্র' ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রশ্নে উপরের যে কোনো একটি পক্ষ, অবস্থান বা মতকে দর্শনসম্মত কিংবা দার্শনিক মত হিসেবে গ্রহণ এবং অপরাপরগুলোকে বর্জন করা সম্ভব। আসলে দর্শনে তো কোনো 'প্রমাণ' নাই, হতে পারে না। অধিকতর গ্রহণযোগ্য যুক্তিকে (argument) আমরা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ, উপস্থাপন ও অনুসরণ করি।

যাহোক, দর্শন ও দার্শনিকের এই পার্থক্য যদি আমরা বুঝি তাহলে এতক্ষণে এটা খুবই পরিষ্কার যে ইসলামী ধর্মতত্ত্বের আওতাবহির্ভূত 'দার্শনিক ব্যাখ্যা'

কেন এবং কোন্ যুক্তিতে ইসলামের দিক হতে গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মতাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত ইসলাম-এর আওতার মধ্যে থেকে কীভাবে 'দর্শনচর্চা' সম্ভব, তাও উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায়।

আগেই বলেছি, ইসলামের সমর্থন এবং বিরোধিতা উভয় প্রকারের দর্শনই 'ইসলামী দর্শন'। সোজা কথায়, 'ইসলাম নিয়ে দর্শন চর্চা' মাত্রই তা ইসলামী দর্শন হিসেবে গণ্য হবে। যেমন, মনোদর্শন। যারা বস্তু অতিরিক্ত একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা 'মন'-এর অস্তিত্ব থাকার পক্ষে যুক্তি দেন, তারাও মনোদার্শনিক। আবার এ ধরনের কোনো 'মন'-এর অস্তিত্বের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যারা যুক্তি দেন, তারাও মনোদার্শনিক হিসেবে গণ্য। ধর্মদর্শন হলো মূলধারার দর্শনের একটি পরিচিত শাখা। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা বা খণ্ডন করা— এর কোনোটিই ধর্মদর্শনের কাজ নয়। আবার ধর্মদর্শনের যত আলোচনা তার প্রত্যেকটি শেষ পর্যন্ত ধর্মের পক্ষ বা বিপক্ষেই যাবে। ব্যাপার হলো, ধর্মকে নিয়ে দর্শন চর্চা, তা ধর্মের পক্ষেও যেতে পারে, বিপক্ষেও যেতে পারে। যে কোনো অবস্থাতেই তা দর্শন, যদি তাতে যুক্তির ব্যবহার থাকে। এই যুক্তির উপস্থাপনায় ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স আসতে পারে। তবে তা ধর্মের পদ্ধতিতে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য-মান্য (dogma) হিসেবে নয়।

ইসলাম ব্যাখ্যার ইসলামসম্মত পদ্ধতি

ইসলামের উন্মুক্ত ব্যাখ্যা-ভাষ্য পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক দুটি উৎস কী বলে, এবার তা খানিকটা খতিয়ে দেখা যাক। ইসলাম স্বয়ং কোরআনকে বুঝা, ইসলামকে মানা বা বুঝা ও ইসলামের ব্যাখ্যাদান পদ্ধতি (way of interpretation) পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে।

আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন,

> "পাঁচটি বিষয়ের উপর কোরআন নাযিল হয়েছে: (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকাম, (৪) মুতাশাবিহ ও (৫) আমসাল (বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ঘটনাবলি)। সুতরাং, তোমরা হালালকে হালাল জানবে। হারামকে হারাম মানবে। মুহকামের উপর আমল করবে। মুতাশাবিহের উপর ঈমান রাখবে। আর আমসাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।"
>
> [মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদীস নং ১৮২]

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে তিনি বলেছেন,

> "করণীয় তিন প্রকার: এমন করণীয় যা স্পষ্টতই ভালো, তা পালন করো। এবং এমন করণীয় যা সুস্পষ্টভাবে মন্দ, অতএব তা পরিহার করো। এবং সেই কাজ যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে, তা মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর উপর ন্যস্ত করো।"
>
> (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদীস নং ১৮৩)

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক কোরআনে দুই ধরনের আয়াত রয়েছে: (১) আয়াতে মুহকাম (সুস্পষ্ট আয়াত) এবং (২) আয়াতে মুতাশাবিহ (রূপক অর্থের আয়াত)। এ সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের আয়াতটি স্ব-ব্যাখ্যাত (self-explanatory)। আল্লাহ বলছেন,

> "তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কিছু আয়াত 'মুহকাম', এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ', যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহসমূহের পেছনে লেগে থাকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা গভীর জ্ঞানী তারা বলে, 'আমরা এগুলোর উপর ঈমান এনেছি। এসব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত। এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"
>
> [সূরা আলে ইমরান: ৭]

উল্লেখ্য, "বলো, আল্লাহ অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো পুত্র নন, কারো পিতাও নন। তার সমকক্ষ কেউ নাই।" কিংবা, "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো" ইত্যাদি ধরনের আয়াত হলো মুহকাম আয়াত। আবার "আল্লাহ হলেন আলোর ভিতর আলো [নুরুন আলা নুর]" এ ধরনের আয়াতগুলো হলো মুতাশাবিহ আয়াত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুহকাম আয়াতসমূহকে মান্য করতে হবে। কিন্তু সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফকীহদের মধ্যে যেসব মতানৈক্য হয়েছে, তার কী হবে? আল-কোরআনকে সামঞ্জস্য (consistent) হিসেবে মানবো কিনা, তা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বীয় যুক্তি ও বুদ্ধির দাবিকে মেনে নিয়ে যারা ইতোমধ্যে ঈমান এনেছে তাদের পরবর্তী কাজ হলো আপাত বিরোধের আড়ালে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যতাকে খুঁজে বের করা। ফিকাহর ভাষায় যাকে 'তাহকীক' বলা হয়। অতএব, ইসলামকে সামগ্রিকভাবে

(holistically) গ্রহণ করাটা ইসলামের দিক থেকে অবশ্য কর্তব্য। ইসলামের কোনো একটা বা কয়েকটা দিককে গ্রহণ করে কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করলে তা, এমনকি তার সবকটি উপাদান, স্বতন্ত্রভাবে ইসলামসম্মত হওয়ার মতো পরিস্থিতিতেও সর্বোপরি বিষয়টি ইসলামবহির্ভূত হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

> "... তোমরা কি (তাহলে) আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং আরেক অংশ অবিশ্বাস করো?"
>
> [সূরা বাকারা: ৮৫]

কোন ব্যক্তিবর্গের আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে ইসলামের কোনো বিশেষ বিষয়ে সঠিক মত হিসেবে নিতে হবে, সে সম্পর্কে ইসলামে পরিষ্কার ভাষায় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

> "আমার পর তোমাদের মধ্যে লোকেরা শীঘ্রই নানা মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নত এবং সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের রীতিনীতি দাঁতে কামড়ে ধরার মতো করে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে নতুন কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।"
>
> [আহমদ, আবু দাউদ, তিরমীযী ও ইবনে মাজাহ সূত্রে মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ১৬৫]

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন,

> "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যে পর্যন্ত তোমরা এ দুটি মজবুতভাবে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পথ হারাবে না। এ দুটি হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ।"
>
> [মুয়াত্তা সূত্রে মিশকাতুল মাসাবিহ গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ১৮৬]

ইসলাম অনুসরণ করার ব্যাপারে বহুত্ব শুধু নয়, বৈপরিত্যও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমভাবে অনুমোদিত। সফরে রোযা রাখা না রাখা, বনু কুরাইযাতে পৌঁছতে গিয়ে এক দল কর্তৃক আসরের নামায পথিমধ্যে পড়া এবং আরেক দল কর্তৃক কাযা করা, অবরোধ চলাকালীন শত্রুপক্ষের ফলবান খেজুর গাছ কাটা বা না কাটা ইত্যাদি এর উদাহরণ। ইসলামে ব্যাখ্যাগত বৈচিত্র্য দেখা যায় শরীয়াহর ক্ষেত্রে। কিন্তু আকীদার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আকীদাগত তথা

ফিলোসফিক্যাল আসপেক্টে ইসলাম কোনো প্রকার সমঝোতা অনুমোদন করে না। বলা যায়, এই একটি ক্ষেত্রে ইসলাম সাদা-কালো নীতি অনুসরণ করে। এমনকি আস্তিকতার কেবল একটি সুনির্দিষ্ট ভাষ্যকেই ইসলাম অনুমোদন করে।

"নিশ্চয়, আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম" অথবা, "তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করো না"— এ ধরনের আয়াতসমূহের তাৎপর্য খুবই পরিষ্কার। আমলের ক্ষেত্রে অপারগ পরিস্থিতিতে কমবেশি করার অনুমোদন থাকলেও ইসলামের আকীদা তথা ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এর অনুমোদন নাই। ইসলামের ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিজের মতো করে নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নাই। উপরের হাদীসগুলো ভালো করে পড়লে দেখা যাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) যেভাবে বলেছেন ও সাহাবাগণ যেভাবে বুঝেছেন– তার বাইরে গিয়ে ইসলামের কোনো 'ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং' হাজির করার এখতিয়ার ইসলাম কাউকে দেয় না।

> "একবার উমর (রা.) রাসূলের (সা.) নিকট এসে বললেন, 'আমরা ইহুদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কথাবার্তা শুনে থাকি, যা অত্যন্ত চমৎকার মনে হয়। এগুলোর কিছু লিখে রাখতে আপনি আমাদের অনুমতি দেবেন কি?' রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, 'ইহুদী-খৃস্টানদের মতো তোমরাও কি দ্বীনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছো? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দ্বীন নিয়ে এসেছি। মুসাও (আ.) যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁকেও আমাকে অনুসরণ করতে হতো।"
>
> [মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদীস নং ১৭৭]

এই হাদীস অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলামের উৎস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। দর্শন তো দূরের কথা, অন্য ধর্মের কোনো গ্রন্থকেও প্রাইমারি সোর্স হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

ইসলামে দর্শনের পরিসর

তাহলে আগের সেই কথা আবার এসে যায়— ইসলামে দর্শন চর্চার সুযোগ কিংবা পরিসর কী? বুদ্ধিগত জ্ঞানকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে যেমন বুদ্ধিবাদ চর্চা হয়ে আসছে, অভিজ্ঞতাকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে যেমন অভিজ্ঞতাবাদের সব তত্ত্ব চর্চা

হয়ে আসছে; তেমনিভাবে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অনুকূলে ইসলামী দর্শন চর্চা সম্ভব। এর বাইরে 'ইসলাম'-এর বিষয় নিয়ে দর্শন চর্চা হতে পারে। তবে তা ইসলামসম্মত নয়। যদিও তা জানাটা ইসলামের ভেতরকার অবস্থান থেকে (ইসলামী) দর্শন চর্চার জন্য অপরিহার্য। উল্লেখ্য, অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মতো মূল শাখাসমূহ ব্যতিরেকে দর্শনের অপরাপর সব শাখা 'philosophy of something' প্যাটার্নে পরিচিত, পঠিত ও চর্চিত হয়। যেমন, philosophy of language ইত্যাদি। এভাবে ইসলামী দর্শনও দর্শনেরই একটি শাখা বিশেষ। দর্শনের প্রচলিত বিষয়বস্তুর কোনোটিই ইসলামী দর্শনের আওতাবহির্ভূত নয়।

ইসলাম সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক গ্রন্থসমূহ তথা কোরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত মূল পরিভাষা হচ্ছে 'দ্বীন'। দ্বীন অভিন্ন ও অবিভাজ্য। বাংলায় সাধারণত দ্বীনকে 'ধর্ম' হিসেবে অনুবাদ করা হয়, আর ইংরেজিতে religion। ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা– এগুলো আমাদের বলা বা উপস্থাপনাগত ব্যাপার। ইসলামের ভেতর থেকে ইসলাম একটি দ্বীন। কেউ মানুক বা না মানুক কিংবা আংশিক মানুক, অথবা 'আদ্-দ্বীন'-এর কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কোনো ককটেল বানাক, সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপার। দ্বীন হিসেবে ইসলাম প্রথমত ধর্ম, এরপর দর্শন বা আর যা কিছু। ইসলামের দিক থেকে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মোকাবেলায় দার্শনিক ব্যাখ্যা তাই গ্রহণযোগ্য নয়। উপরে উল্লিখিত কোরআন এবং হাদীসের উদ্বৃতিসমূহ এ বিষয়কে নিশ্চিত করে। অবশ্য ইসলামের উপর যারা স্বীয় মর্জি-মোতাবেক একটি ব্যাখ্যা চাপিয়ে দর্শনের নামে একে লেজিটিমেট করতে চাইবেন, তারা উপরোল্লিখিত সুস্পষ্ট ও স্বব্যাখ্যাত সূত্রগুলোসহ এ ধরনের তাবৎ দলীল-প্রমাণকে নিছক 'ধর্মতাত্ত্বিক' হিসেবে নাকচ করে দেয়ার 'অধিকার' (?) রাখেন!

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রচেষ্টা কি আদৌ নিরপেক্ষ?

ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়ের কথা যারা বলেছেন, তারা ধর্মের উপর দর্শনকে চাপিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে ধর্মকে নাকচ করেছেন। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ স্পষ্টত ধর্মবিরোধী। অজ্ঞেয়বাদ ও নির্বিকারবাদ যেমন মূলত নাস্তিকতাবাদ, তেমনি যারা ধর্মকে ফিলোসোফাইজ করতে চান, ধর্মের রেফারেন্সমুক্ত ইন্টারপ্রিটেশন দাঁড় করাতে চান তারা আদতে ধর্মেরই গোড়া কাটার লোক। ধর্মের সমর্থনে যদি দর্শন হতে না পারে, তাহলে আল-গাজ্জালীকে দার্শনিক গণ্য করাটা

আগাগোড়াই ভুল। স্মরণ করা যেতে পারে, মুসলিম দর্শনের দুনিয়াজোড়া সব পাঠক-পণ্ডিতই মনে করেন, আবু হামিদ আল-গাযালী হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক।

যাহোক, ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রচেষ্টার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে ইবনে রুশদের নামটি সবার উপরে ভেসে উঠে। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের অনুসারী। অ্যারিস্টটল দার্শনিক আলোচনা অনুধাবনের সক্ষমতা-অক্ষমতার নিরিখে মানুষকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। অ্যারিস্টটলের শিক্ষক প্লেটো তার কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। বিশিষ্ট peripatetic (pro-Greek) দার্শনিক হিসেবে ইবনে রুশদও নাগরিকদেরকে জ্ঞানগত তারতম্যের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

১। আলঙ্কারিক (rhetoric) পদ্ধতি— জনসাধারণের পদ্ধতি
২। যুক্তিসিদ্ধ (dialectical) পদ্ধতি— ধর্মতাত্ত্বিকদের পদ্ধতি
৩। প্রতিপাদক (demonstrative) পদ্ধতি— দার্শনিকদের পদ্ধতি।

‘দার্শনিকদের জন্য আলাদা ও সর্বোচ্চ মর্যাদা’— এই পদ্ধতির দলীল হিসেবে তিনি উপরে উদ্বৃত সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতকে একটি মৌলিক পরিবর্তনসহ উল্লেখ করেন। উক্ত আয়াতে ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না’ এরপর একটি ওয়াকফে লা’যেম (অত্যাবশ্যকীয় বিরতি চিহ্ন) রয়েছে। দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত কোরআনের সকল কপিতেই এটি রয়েছে। কিন্তু ইবনে রুশদের প্রস্তাবনায় এই ওয়াকফে লা’যেম চিহ্নটি হবে ‘আর যারা গভীর জ্ঞানী’ এর পরে। তাতে করে আয়াতটির পাঠ দাঁড়ায় এমন: ‘আল্লাহ এবং যারা গভীর জ্ঞানী, তারা ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।’

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিকল্প হিসেবে ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে ইবনে রুশদের এই ব্যাখ্যাও মেনে নিতে হয়! মানুষের মধ্যে জ্ঞানগত পার্থক্য কি নাই? যদি থাকে তাহলে একে ভিত্তি ধরে মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ কয় ধরনের হতে পারে? এসব প্রশ্ন তৈরি হওয়া যতটা স্বাভাবিক, এর উত্তরও ততটাই সহজ। জ্ঞানগত দিক থেকে মানুষে মানুষে বেশকম হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এ বিষয়টি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও এর ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীবিন্যাসকরণ ভুল।

জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষেকে তিন বা চার ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা চার,

পাঁচ, ছয়, সাত ইত্যাদি অনেক ভাগেই ভাগ (category) করা সম্ভব। তবে এই বিভাজন ও প্রত্যেক গ্রুপের নিজেদের মতো করে টেক্সট ব্যাখ্যার বৈধতা থাকলে ইসলাম বা অনুরূপ তাৎপর্যপূর্ণ কোনো বিষয়েরই স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে না। এ বিষয়ে অর্থাৎ ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যের সাথে ব্যাখ্যার বৈপরিত্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের জ্ঞানগত পার্থক্যকে ইসলাম বাস্তবসম্মত মনে করে। কোরআন ও হাদীসের প্রচুর রেফারেন্স রয়েছে যাতে জ্ঞান, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানীর উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানগত দিক থেকে মানুষ দুই ধরনের: যারা জানে আর যারা জানে না। যারা জানে না, তাদের দায়িত্ব হলো যারা জানে তাদের কাছ হতে জেনে নেয়া। কে জানে আর কে জানে না, তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। অতএব, এমনও হয় কিংবা হতে পারে— কেউ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্যদের তুলনায় বেশি জানে। অথচ একই ব্যক্তি অন্য কোনো বিষয়ে কম জানে।

অতএব, কে বেশি জানে আর কে কম জানে তা জানার কোনো বিষয় ও প্রেক্ষাপট নিরপেক্ষ পদ্ধতি নাই। মানুষের জ্ঞানগত মর্যাদা নিরূপণের বিষয়ে ইসলাম অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ (objective)। যিনি (বেশি) জানেন তিনি স্বীয় জ্ঞানের দাবি অনুসারে কাজ করবেন বা করতে চাইবেন। সংশ্লিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতিই প্রমাণ করবে, তার উক্ত দাবি সঠিক কিনা বা কতটুকু সঠিক। আলেমে দ্বীন, ফকীহ, মুজতাহিদ ইত্যাদি মর্যাদাপূর্ণ শব্দাবলীর মাধ্যমে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য রচনার অধিকার (authority) বুঝায় না। এগুলো বরং কিছু ব্যক্তির জ্ঞানগত আধিক্য ও পরিশুদ্ধিকে নির্দেশ করে মাত্র।

ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পার্থক্য

ব্যক্তি আগে? নাকি সমাজ আগে? সমকালীন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে পুঁজিবাদ কর্তৃক সমাজের তুলনায় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার নীতিকে খণ্ডন করতে গিয়ে এই প্রশ্নটি এসেছে। সাম্যবাদীদের দৃষ্টিতে সমাজ আগে, ব্যক্তি পরে। পুঁজিতান্ত্রিক মতাদর্শে এ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বিভিন্ন রকম হলেও মোটের ওপর বলা যায়, 'সমাজের তুলনায় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া' পুঁজিবাদের অন্যতম নীতি। একে উদারনৈতিকতাবাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও বলা হয়। তবে এইসব ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়ে ফোকাস না করে আমরা ধরে নিচ্ছি, পুঁজিবাদের বিকল্প মতবাদ হিসাবে সাম্যবাদ ব্যক্তিস্বার্থের তুলনায় সামাজিক স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অতএব, 'ব্যক্তি আগে, নাকি সমাজ আগে'— এ ধরনের প্রশ্ন আদৌ সঠিক কিনা, তা নিয়েই কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে। ব্যক্তিস্বার্থ তথা ব্যক্তিমানুষকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন হতে পারে না। আবার সামষ্টিক-স্বার্থ তথা সমাজকে উপেক্ষা করে ব্যক্তির অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। অতএব, 'ব্যক্তি আগে, নাকি সমাজ আগে'— এই ধরনের প্রশ্নের মানে হলো, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যক্তির ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে, নাকি সমাজের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা। কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে, ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়ার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সম্পদ ও স্বাধীনতাকে যথাসম্ভব রক্ষা করে উন্নততর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা। আর সমাজকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানে হলো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তথা সামষ্টিক উন্নয়নের মাধ্যমেই ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটানোর নীতি গ্রহণ। এই দুই কর্মনীতির কোনটি সঠিক তা নিয়ে পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে নানা পর্যায়ে বিরোধ রয়েছে। এই

বিরোধের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। এখানে বরং বিষয়নিষ্ঠ পদ্ধতিতে (thematic approach) 'ব্যক্তি আগে, নাকি সমাজ আগে'— এই প্রশ্নে ইসলামের অবস্থান যাচাই করে দেখা হবে।

এই আলোচনার সারসংক্ষেপ দুইটি। প্রথমত, ব্যক্তি বনাম সমষ্টি— এই ধারায় আলোচনার ব্যাপারটিই অনৈসলামিক। এটি একটি পাশ্চাত্য বিতর্ক এবং ইসলামের ওপর তা আরোপিত। অতএব, এক অর্থে অপ্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়ত, তারপরও 'ব্যক্তি আগে, নাকি সমাজ আগে'— এই প্রশ্নে ইসলাম কি বলে তা জানার জন্য কেউ খুব বেশি আগ্রহী হলে, অর্থাৎ ব্যক্তি কিংবা সমাজের কোনো একটি অন্যটির আগে হবে— এমন বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে কেউ যদি ইসলামের দিক থেকে এর উত্তর ঠিক করতেই চান, তাহলে তার জন্য সঠিক উত্তর হচ্ছে— ইসলামে ব্যক্তি আগে, সমাজ নয়।

যা হোক, সমাজের ওপর গুরুত্বারোপ সংক্রান্ত ইসলামের ভাষ্যগুলোর তালিকা করা হলে তা বেশ দীর্ঘই হবে। সমষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে কোরআন-হাদীসের সেইসব রেফারেন্স পর্যালোচনা করলে মনে হতে পারে, ইসলাম এক ধরনের সর্বাত্মকবাদকেই (totalitarianism) সমর্থন করে। আবার ব্যক্তিমানুষকে মূল বিবেচনায় রেখে ও অধিক গুরুত্ব দিয়ে কোরআন-হাদীসে যেসব অকাট্য সূত্র (নস্) রয়েছে, সেগুলোকে সামনে রেখে বিষয়টিকে কেউ বুঝার চেষ্টা করলে মনে হতে পারে, নিজস্ব ধরনে ইসলাম শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেই (individualism) সমর্থন করে। বিষয়টি মুসলিম দর্শনের প্রাথমিক যুগে কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলীল-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে ইচ্ছার স্বাধীনতাপন্থী ও অদৃষ্টবাদী যথাক্রমে কাদারিয়া ও জাবারিয়া নামের দুটি বিপরীত মতানুসারী ধর্মতাত্ত্বিক-দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে উঠার মতো।

শারীরিক ও বস্তুগত গঠন এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার বিষয়সমূহ 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' সম্পর্কিত বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়। আমাদের কাণ্ডজ্ঞান অনুসারে 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' বলতে সাধারণভাবে যা বুঝানো হয়, ব্যক্তির দিক থেকে তা একটি বাস্তব ব্যাপার। অতএব, মানুষ স্বাধীন। আবার জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসাবে তাওহীদি ধারায় আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হলে সেই ধরনের একক পরমসত্তার পক্ষে স্বয়ং-সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান হওয়াটাও বাঞ্ছনীয়। যদি তাই হয়, তাহলে তাঁর দিক থেকে মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক 'কর্মটি সম্পাদনের পরে জানা যাবে' (yet to know) ধরনের হতে পারে না।

অতএব, আল্লাহর দিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষের (খোদায়ী শক্তি বহির্ভূত) ‘স্বতন্ত্র’ ইচ্ছা ও স্বয়ং-স্বাধীনতা (absolute freedom অর্থে) তথা ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়। মানুষ যেহেতু কল্যাণ লাভ করতে চায়, আর কল্যাণ লাভের একমাত্র পন্থা যেহেতু সৎকর্ম সম্পাদন এবং যেহেতু মানুষ জানে না যে আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য কী পরিণতি অপেক্ষমান— তাই মানুষের জন্য একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা হলো সৎকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে— এই ধারণার পক্ষে কোরআন-হাদীসে বর্ণিত রেফারেন্সগুলোকে বুঝতে হবে, ‘জগতের দিক থেকে ঈশ্বর’ (from world to God)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে। আর ইচ্ছার স্বাধীনতার বিপক্ষে কোরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত সূত্রসমূহকে বিবেচনা করতে হবে ‘ঈশ্বরের দিক থেকে জগত’ (from God to world) — এই দৃষ্টিকোণ হতে। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে আশারিয়া সম্প্রদায় এই ধাঁচেই বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে। আবু হামিদ আল গাযালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কিত দার্শনিক সমস্যাটির সাথে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা কী— তা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের ফাউন্ডেশনাল টেক্সটগুলোতে এসব বিষয়ে যা বলা আছে, আপাতদৃষ্টিতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। আসলে সুন্নাহর সার্বজনীন লাইন অব কনসিসটেন্সির আলোকে না দেখে ইসলামকে ইসলামের মতো করে বুঝা অসম্ভব। মনে রাখতে হবে, কোনো কিছুকে সমর্থন করা বা সঠিক মনে করা এক জিনিস, আর সেটিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা ও তুলে ধরা ভিন্ন ব্যাপার। যদিও দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথমটির পূর্বশর্ত।

আগেই বলা হয়েছে, ইসলামের ফাউন্ডেশনাল টেক্সটে ব্যক্তিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যেসব দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য রয়েছে তাতে মনে হবে— ইসলাম ব্যক্তিকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আবার সমাজকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যেসব নস্ রয়েছে তাতে মনে হবে— ইসলামে ব্যক্তি নয়, সমাজই অগ্রগণ্য। বলাবাহুল্য, ইসলামের ফাউন্ডেশনাল টেক্সট তথা কোরআনকে এর সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপটের আলোকে পাঠের পদ্ধতিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। শুধু তাই নয়, প্রেক্ষাপট বিবেচনার অংশ হিসাবে রাসূল (সা.) কোনো আয়াত নাযিল হওয়ার পর উক্ত বিষয়ে কী করেছেন, সাহাবাগণ এ বিষয়ে কী বুঝেছেন ও করেছেন ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়েই সংশ্লিষ্ট আয়াতকে বুঝতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। এক কথায়, ইসলাম বুঝার জন্য সামগ্রিকতা

ও সামঞ্জস্য-বিবেচনা একটি অপরিহার্য বিষয়।

পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ— এই উভয় মতবাদে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু বিষয় যেমন আছে, আবার ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু বিষয়ও আছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে উভয় মতবাদই কোনো কোনো বিবেচনায় ইসলামী এবং কোনো কোনো বিষয়ের নিরিখে ইসলামবিরোধী। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মতবাদকে যদি কর্মনীতি ও দার্শনিক দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করি, তাহলে দেখা যাবে এ দুটোর কর্মপন্থাগত কিছু দিককে ইসলাম সমর্থন করছে। যেমন, ব্যক্তি-উদ্যোগ ও সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানা ব্যবস্থাকে ইসলাম সমর্থন করে। অন্যদিকে, সহায়-সম্পদের বিষয়ে যথাসম্ভব সমতা অর্থে সাম্যের ধারণা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও ইসলাম সমর্থন করে।

এই মতবাদ দুটির দার্শনিক দিকগুলো আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মনে হলেও এ দুটিই অভিন্ন একটি উৎস-মতবাদের ভিন্ন প্রকরণ মাত্র। সমাজবাদ ও ব্যক্তিবাদ উভয়ের উৎস হলো বস্তুবাদ। বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার স্বতন্ত্র আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ফলে আধুনিককালে যেসব শাখা-মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে, এ দুটি তার অন্যতম। বস্তুবাদ-উৎসারিত হওয়ায় পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ— উভয় মতবাদকেই ইসলাম স্বীয় তাওহীদের তাত্ত্বিক জায়গা হতে বিরোধিতা করে। ইসলাম বস্তুবাদকে খণ্ডন করে তাওহীদভিত্তিক একটি একক ও সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পুঁজিবাদে সমাজ হলো উপায়, ব্যক্তি-মানুষই লক্ষ্য। সাম্যবাদে সামষ্টিক-মানুষ তথা সমাজই লক্ষ্য, আর ব্যক্তি হলো উপায়। লক্ষ্য ও উপায়ের (end and means) এই বাইনারিসহ যে কোনো তাত্ত্বিক বিষয়কে সাদা-কালো বাইনারিতে দেখাটা অন্যতম পাশ্চাত্য ফেনোমেনা। অথচ ইসলামে একদৃষ্টিতে যা উপায়, অন্যদৃষ্টিতে তা-ই লক্ষ্য।

'from world to God'— এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে বিবেচনা করলে ইসলামে আল্লাহই হলেন একমাত্র লক্ষ্য, বাদবাকি সব হলো উপায়। উপায় ও লক্ষ্যের এই বিভাজন শুধুমাত্র সৃষ্টজগতের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহর মহান সত্তার স্বগতদিক (Allah by Himself) থেকে উপায় ও লক্ষ্যের এই বিভাজন অর্থহীন। যা হোক, সামগ্রিকভাবে জগত একটি উপায় হলেও জগতের বিষয়গুলো আবার পরস্পর সাপেক্ষে উপায় ও লক্ষ্যে বিভাজিত। কোনো একটি বিষয়ে যেটি উপায়, ক্ষুদ্রতর (imperfect অর্থে) অবস্থান হতে তারও নিম্নস্তরের কোনো কিছুর জন্য তা লক্ষ্য বটে।

আগেই বলা হয়েছে, ইসলামের জগত ও জীবনদৃষ্টি অখণ্ড, ধারাবাহিক ও সামগ্রিক ধাঁচের। এই দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও জগত পরস্পরের পরিপূরক। বিশ্বজগতে পরমসত্তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। অতএব, জগত উপায়, মানুষই লক্ষ্য। আবার মানুষের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করা। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এসব কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। দেখা যাচ্ছে, একটি লক্ষ্য পরবর্তী উচ্চতর লক্ষ্যের নিরিখে উপায় হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। ইসলামের এই ক্রমসোপানমূলক জগতদৃষ্টিকে বুঝতে না পারার অন্যতম পরিণতি হলো, ইসলামের ওপর ‘ব্যক্তি আগে নাকি, সমাজ আগে’ ধরনের প্রশ্ন আরোপ করে যেনতেনভাবে একটি হ্যাঁ/না ‘উত্তর’কে ইসলামের ওপর অযৌক্তিকভাবে চাপিয়ে দেয়া।

জগতের নিরিখে মানুষকে লক্ষ্য বিবেচনা করলে ইসলামের দৃষ্টিতে একক ব্যক্তি ও সামষ্টিক ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য কোনটি ও উপায় কোনটি? এই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে মানুষের মধ্যকার ব্যক্তি-সমাজ বিভাজনে ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজই লক্ষ্য, ব্যক্তি উপায়। অন্য দৃষ্টিকোণ হতে ইসলামে ব্যক্তিই লক্ষ্য, সমাজ তার উপায় মাত্র। দ্বীন কায়েম হিসাবে বলা হোক বা খিলাফত কায়েম হিসাবে বলা হোক অথবা ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়নের কথা বলা হোক— এসবই মূলত এক এবং তা সামষ্টিকতার ওপরেই অধিকতর গুরুত্বারোপ করে। আবার ইক্বামতে দ্বীনসহ সমস্ত ইবাদতের অভিন্ন ও একমাত্র লক্ষ্য হলো আখেরাতে মানুষের ব্যক্তিগত নাজাতপ্রাপ্তি। আখেরাতে নাজাতপ্রাপ্তির বিষয়টিকে ইসলামের ভেতর থেকে না বুঝার কারণে কিংবা আখেরাতে নাজাতপ্রাপ্তির বিষয়টিকে কার্যত অগ্রাহ্য করে ইসলামকে বৌদ্ধ ধর্মের মতো মনে করার কারণে কোনো কোনো সাম্যবাদী তাত্ত্বিক ‘ইসলামে ব্যক্তি নয়, সমাজ আগে’র মতো ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছেন। ‘পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি’র মতো ইসলামে ‘সাম্যে’র গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি দেখেই তাঁরা ইসলামকে সাম্যবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলছেন। সাম্যসহ এ ধরনের বেশকিছু চিরন্তন মূল্যবোধজ্ঞাপক পরিভাষা আছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে কোনো কর্মের যথার্থতা কিংবা ভ্রান্তি নিরূপনের মানদণ্ডের ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মানদণ্ডগুলো বিরোধপূর্ণ হিসাবে প্রতীয়মান হয়। ওহীর জ্ঞানের সহায়তায় ইসলাম এ ধরনের বিরোধ নিরসন করে।

কথিত আছে, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, দুনিয়ার সব মানুষ যদি বেহেশতে যায়, তাতে আমার কী লাভ, যদি আমি যেতে না পারি? আর দুনিয়ার সব মানুষ

যদি দোযখে যায় তাতে আমার কী ক্ষতি, যদি আমি তা হতে বাঁচতে পারি? কথাটির সূত্রগত যথার্থতা যাই হোক না কেন, এতে মানুষের জীবনোদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কর্মে রত হওয়া ও দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সামাজিকতা ও সামষ্টিকতার কথা বললেও ইসলামে দায়বোধের বিষয়টি সদা-সর্বদাই ব্যক্তিগত। হাদীসে বলা হয়েছে, "সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" এই দৃষ্টিতে ব্যক্তি-মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই মহান আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য পরীক্ষা, প্রতিটি পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য একটা পরীক্ষা। প্রতিটা পরীক্ষাই তার সৎকর্মশীলতা প্রমাণের একটা সুযোগ।

ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কোনো কাজ ইসলাম অনুমোদন করে না। বিচ্ছিন্ন ও একক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বাস্তব জগতে যেসব সংঘ বা সমিতি গড়ে উঠে, সেসব প্রতিষ্ঠানেও ইসলাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যথাসম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করে। তৎসত্ত্বেও সামষ্টিক স্বার্থের বিপরীতে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ কোনো অধিকার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ক্ষুন্ন হয় বা হতে পারে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। ইচ্ছার স্বাধীনতা যেমন মানুষের পাখির মতো উড়ার ক্ষমতাকে বোঝায় না, তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতেও মানুষের যা ইচ্ছা তাই করা বোঝায় না। বরং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কথাটি ব্যক্তির অধিকারসমূহের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপকে বুঝায়। এমনকি মৃত্যুদণ্ডের মতো চূড়ান্ত শাস্তির ক্ষেত্রেও ইসলাম ব্যক্তির অধিকারকে সংরক্ষণ করে।

সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বস্তুবাদী চিন্তাধারা প্রভাবিত পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে অপরাধ দমনে অনন্যোপায় হয়ে মৃত্যুদণ্ড দানের বিধান জারি রেখেছে বটে। তবে এ বিষয়ে তাদের প্রধান তাত্ত্বিক অবস্থান হলো, অপরাধ যাই হোক না কেন, শাস্তি কার্যকর করার পর সেই ব্যক্তির সংশোধনের সুযোগ থাকে না। তাই মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। অতএব, তা অন্যায়। পাশ্চাত্য ধারায় চিন্তা করলে এমনটা মনে করাই স্বাভাবিক। কারণ, উদ্দেশ্যহীন অন্ধ বিবর্তনের ধারায় সৃষ্ট এই জগতে সামগ্রিক অর্থে আদতে অর্থহীন এই জীবনের পরিসমাপ্তি মানে সব শেষ। অতএব, অপরাধ যাই হোক, মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ব্যক্তিকে সংশোধন ও উত্তরণের সুযোগ দিতে হবে।

ইসলামে জীবন ও জগতের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহজীবনে ন্যায়সঙ্গত বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি তওবা করার সুযোগ পায়। আন্তরিকভাবে তওবাকারীর তওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় ব্যাভিচারের স্বীকারোক্তি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণকারী মহিলা সাহাবী হযরত গামেদী (রা.) সম্পর্কে কোনো এক প্রসঙ্গে কেউ অশোভন মন্তব্য করায় রাসূলুল্লাহ (সা.) খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, মদীনার সব অধিবাসীদের মধ্যে যদি তার তওবাকে ভাগ করে দেয়া হয়, তবে তা তাদের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি অপরাধের পরেও অনুতপ্ত নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে সে অনুতপ্ত ও সংশোধন হতে পারে— এই সম্ভাবনার কারণে তাকে প্রাপ্য শাস্তি না দেয়ার মানে হলো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া মানে সমাজকে অস্বীকার করা নয়। আর ব্যক্তির সংশোধনই শাস্তির একমাত্র লক্ষ্য নয়। অপরাধ স্বীকারে অস্বীকৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হয় সমাজকে টিকানোর জন্য। অতএব, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাও শাস্তি প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ব্যক্তির আকাঙ্খাসমূহ প্রায়ই পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেগুলোর বাছবিচার ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়। এটি হলো ব্যক্তির ব্যক্তিগত নৈতিকতা নির্ধারণের প্রক্রিয়া। ব্যক্তির সমষ্টি হিসাবে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোও ব্যক্তি-আদলে (in an organic way) নিজ নিজ নৈতিকতা গড়ে তোলে। এক কথায়, চাহিদা ও কর্মের ক্রমসোপান নির্ধারণ করা নৈতিকতার মান নির্ধারণ করারই নামান্তর। এভাবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সব পক্ষই সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। ইসলাম অনুসারে মানবজীবনের ধারাবাহিকতা ও নৈতিক ধারাবাহিকতা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। তাই ইহলৌকিক জীবনকে বাদ দিয়ে পারলৌকিক জীবন বা পারলৌকিক জীবনকে বাদ দিয়ে ইহলৌকিক জীবনের কোনোটাই ইসলামসম্মত নয়। আখিরাতে সাফল্য অর্জনের বিষয়কে লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করলে ইহলৌকিক জীবন হলো মাধ্যম। আবার পারলৌকিক জীবনে উপযুক্ত প্রাপ্তির মাধ্যমে ইহলৌকিক জীবনের অপ্রাপ্তি ও অন্যায়সমূহকে মেটানোর ধারণা প্রমাণ করে, পারলৌকিক জীবন হলো ইহলৌকিক জীবনের যৌক্তিক সমাধান তথা মাধ্যম বা উপায়।

ব্যক্তি বনাম সমাজ দ্বিবিভাজনটি শুধু নয়, পাশ্চাত্য চিন্তার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো দ্বান্দ্বিক, সাদা-কালো ধরনের তথা বাইনারি। প্রায়ই তারা মনে করে, কোনো একটি বিষয়ে কেবল একটি মতই সঠিক হবে। অনেকটা ‘ডিম আগে না মুরগী আগে’ ধরনের প্রশ্ন বা সংকট। ইসলামের তাওহীদকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় এটি বড় কোনো সমস্যা নয়। ডিমের আগে মুরগী হলে তা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আবার মুরগীর আগে ডিম হলে তা সৃষ্টি করার ক্ষমতাও তিনি রাখেন।

ধরুন, একটি জায়গায় একজনের জন্য একটি মাত্র ঘর হবে— এই ধারণা নিয়ে কতিপয় ব্যক্তি বিরোধে লিপ্ত হলো। এ ক্ষেত্রে তারা অপর কাউকে বিরোধ নিষ্পত্তিকারী ‘লেভিয়াথান’ মানতে পারে অথবা লটারি করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ‘একটি জায়গায় একজনের থাকার জন্য একটি ঘরই নির্মাণ সম্ভব’ ধারণাটির পরিবর্তে যদি ‘একটি জায়গায় একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করা সম্ভব’ ধারণাটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে প্রত্যেকেরই একটি করে ঘর থাকতে অসুবিধা হয় না। ইসলাম এ ধরনের সমন্বয়মূলক ও সামগ্রিক চিন্তাধারাকেই প্রমোট করে। দুঃখজনক বিষয় হলো, সব ধরনের তাত্ত্বিক বিষয়েই পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মূলস্রোত ভাসা-ভাসা, সাংঘর্ষিক ও দ্বান্দ্বিক কাঠামোর। জ্ঞানতত্ত্ব হতে সমাজতত্ত্ব— সব ক্ষেত্রেই তারা কোনটি সঠিক হবে, তা খুঁজে খুঁজে হয়রান। ইসলামের চিন্তাধারা হলো নিরবচ্ছিন্ন ও ক্রমসোপানমূলক। তাই সমান্তরাল ধাঁচে চিন্তাধারাজনিত (horizontal pattern of thought) গভীর সমস্যায় সমকালীন পাশ্চাত্যমানস সংকটে নিমজ্জিত থাকলেও ইসলাম এই সমস্যা হতে মুক্ত। ‘ব্যক্তি আগে, নাকি সমাজ আগে’ ধরনের চিন্তার পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে জানা ও বুঝার চেষ্টা করাটা ইসলাম বুঝা ও মানার জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্য জগতের প্রভাবশালী একটা অংশ কেন এই ধরনের চিন্তা করে ও কীভাবে তা সমাধানের চেষ্টা করে ইত্যাদি বিষয় পড়াশোনা করাটা ইসলাম প্রচার ও জ্ঞানচর্চা বিষয় হিসাবে গুরুত্বের দাবিদার।

আর্থিক উদ্যোগ গ্রহণ ও উপার্জিত সম্পত্তি লাভের অধিকার তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের নিরিখে ‘ব্যক্তি আগে, নাকি সমাজ আগে’ প্রশ্নটির সমাধানের ওপর একটি দ্বিরুক্তিমূলক মন্তব্য করে আলোচনার এই পর্যায়ের ইতি টানছি। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের দুটি হলো যাকাত ও হজ্ব। এগুলো প্রত্যক্ষভাবে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাকে নিশ্চিত করে। তা সত্ত্বেও ইসলামের কোনো অনুসারী একইসাথে সাম্যবাদেরও অনুসারী হয় কী করে, তা আমার

বুঝে আসে না। সাম্যবাদের গ্রহণযোগ্য ধারণাবলির কিছু কিছুর সাথে ইসলামের মিল আছে। অতএব, ইসলাম = সাম্যবাদ (communism)! এটি কি অদ্ভুদ সমীকরণ নয়? সাম্যের প্রকৃত তাৎপর্য যদি ইসলামেই থাকে এবং এর পাশাপাশি জরুরি আরো অনেক বিষয় ও সেসবের সর্বোৎকৃষ্ট সমাধানও যদি ইসলামেই থাকে, তাহলে সরাসরি ইসলাম অনুসরণে সমস্যা কী? সাম্যবাদ বা অন্য যে কোনো মতবাদের অনুসারীদের সাথে কৌশলগত ঐক্যের ধারণা, আর ইসলামের মতো করে ইসলামকে বুঝা, গণ্য করা ও অনুসরণের ধারণা ভিন্ন দুটি ব্যাপার নয় কি?

উল্লেখ্য, ইসলামী মতাদর্শ ব্যক্তি-মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও এটি পাশ্চাত্য ধরনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মতো অবাধ নয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়সহ নানাবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ইসলাম ব্যক্তির অধিকারকে ততক্ষণ পর্যন্ত সংরক্ষণ করে, যতক্ষণ তা অন্যের অনুরূপ ব্যক্তি অধিকার ক্ষুণ্নের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। একটি সুস্থ সমাজ গঠনে যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলোকে ইসলামী শরীয়ত সুসামঞ্জস্যভাবে স্থান দিয়েছে। ইসলামী শরীয়তের সামঞ্জস্যশীল ও অখণ্ড বুঝজ্ঞানের মাধ্যমেই ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে অনুধাবন সম্ভব।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার

বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণ প্রস্তাবনা হিসাবে গণ্য করলে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারে'র ধারণাগুলো রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক ন্যায়বিচার'সহ এ ধরনের প্রতিটি বিষয়েরই নানা রকমের ব্যাখ্যা আছে। বিশেষ করে, বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে কখনো কখনো সেগুলো সাংঘর্ষিক ও বিপরীতমুখী হতে পারে। যেমন, 'সাম্য' ধারণাটিকে প্রথম দৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয় এর প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থ তারচেয়েও অনেক জটিল। 'মানবিক মর্যাদা', 'সামাজিক ন্যায়বিচার'সহ এ ধরনের যে কোনো তত্ত্বের তাৎপর্য বহু-অর্থবোধক ও জটিল। ফলে, এই ধরনের মিষ্টি কথাগুলোর (popular rhetoric) সাধারণ ব্যবহারে তেমন সমস্যা না থাকলেও এগুলোকে যখন সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে বুঝার চেষ্টা করা হবে তখন সমতা বলতে কী বুঝানো হচ্ছে, কোন্ চিন্তাকাঠামোকে (paradigm) এর তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে, 'সাম্য' বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও পদ্ধতি কী— এসব বিষয় জ্বলন্ত প্রশ্ন হিসাবে উঠে আসবে। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা নির্মাণ করতে গেলে এ বিষয়গুলোর চৌহদ্দি সম্পর্কে পূর্ব-সমাধান জরুরি। নয়তো এগুলো শেষ পর্যন্ত ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদই সৃষ্টি করবে।

উল্লেখ্য, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারসহ সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করার পিছনে 'ভালো লাগা' বা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসাবে 'বিশ্বাস করা'র বাইরে কোনো 'নিরপেক্ষ-বস্তুগত' ভিত্তি বা যুক্তি নাই। সামাজিক ন্যায়বিচারের এক ধরনের ব্যাখ্যা কারো কাছে নিতান্তই যৌক্তিক হতে পারে। আবার, এর তাত্ত্বিক পাঠ-পর্যালোচনায় তার থেকে নানা মাত্রায় ভিন্নতর ব্যাখ্যা — যেগুলোর পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি-'প্রমাণ'ও রয়েছে — অন্য কারো কাছে ভালো লাগতে পারে কিংবা অধিকতর সঠিক মনে

হতে পারে। তাই, পক্ষবিশেষ কর্তৃক সঠিক মনে করার কারণেই কোনো তত্ত্ব বা যুক্তি (একমাত্র অর্থে) যৌক্তিক গণ্য হতে পারে না। এ বিষয়গুলোর নানা রকমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা ভিন্ন পরিসরে হতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে একটা গড়পরতা অর্থ ধরে নিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামী মতাদর্শের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা বা প্রত্যয়গুলোর প্রাথমিক বিশ্লেষণ করা হবে। সবার জানা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মোটের ওপরে বলতে যা বুঝায়, সেভাবে আলোচনা শুরু করা যাক। প্রথম পর্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে এবং দ্বিতীয় পর্বে ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনা করা হলো।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছিলো। এর ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। পরবর্তীতে এই তিন মূলনীতিকে পাশ কাটিয়ে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ— এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে সংবিধান তৈরি করা হয়। অতএব, মুজিবনগরে ঘোষিত তিন মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সংবিধান নতুন করে লিখতে হবে। কোনো কোনো মহল থেকে ইদানীং এ ধরনের কথাবার্তা জোরেশোরে বলা হচ্ছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হওয়াকেই আমি ইতিবাচক হিসাবে গণ্য করি। কমিউনিস্ট এবং ইসলামিস্টসহ সব পক্ষই এতে একোমোডেটেড বোধ করার কথা। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে উঠে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করলে এ ধরনের একটি উদার ও আন্তরিক (moderate and inclusive) অবস্থান গ্রহণের কিছু তাত্ত্বিক ও কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এক সপ্তাহের মাথায় ঘোষিত এই তিন রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় জাতীয় নীতি হিসাবে ঘোষণা করার আগে ও পরে এ বিষয়ে কোনো গণভোট হয়েছিলো? অথবা, এগুলো কি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের দলীয় মূলনীতি ছিলো? আওয়ামী লীগের কোনো দলীয় সভায় বা অন্য কোনো ফোরামে কি এসব মূলনীতির পক্ষে কখনো কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি নেতিবাচক হয় তাহলে এটি মনে করাই যুক্তিসঙ্গত— জরুরি

পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি করে একটি সরকার ঘোষণার সময়ে সংশ্লিষ্টগণ তাৎক্ষণিকভাবে এ কথাগুলো বলা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর প্রবাসী সরকার ঘোষিত তিন মূলনীতি ও ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে গৃহীত চার মূলনীতি– এই দুই মূলনীতি ঘোষণার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের বিষয় হলো, উভয় ক্ষেত্রেই ঘোষণা করার পরেই কেবল দেশের বাদবাকি লোকেরা সেগুলো জেনেছে। কোনোটিই জনগণের সম্মতি (mandate) সাপেক্ষে হয় নাই। জনগণের সম্মতির কোনো বিষয়ের কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে তা ছিলো ছয় দফার প্রতি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের বিপুল সমর্থন। স্বাধীনতা নয়, বরং যার মর্ম ছিলো পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নির্দিষ্ট দলকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভোট দিয়েছেন— এ ধরনের দাবি যেমন ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ, যেমন করে চার মূলনীতির ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার দাবি অগ্রহণযোগ্য; তেমনি '১৭ এপ্রিল মুজিবনগরের অস্থায়ী মঞ্চে ঘোষিত তিন মূলনীতি প্রতিষ্ঠার জন্যই মানুষ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে' মর্মে দাবিও প্রশ্নসাপেক্ষ। দেশে এখনো অনেক মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন, বিশেষ কোনো মূলনীতির জন্য নয়, চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়েছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে জন্মগ্রহণ করার কারণে আমি মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী প্রজন্ম। এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ-পরিচয় হওয়া প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলেছি। দেখেছি, শোষণমুক্ত দেশ গড়াই ছিলো তাদের অভিন্ন লক্ষ্য।

শুরুতে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি এবং পরবর্তীতে সংবিধানে গৃহীত ভিন্ন মূলনীতির বিষয়ে তাদের অবস্থান কী, যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারই বিরোধিতা করেছিল? হতে পারে তাদের বিরোধিতার বিভিন্ন মাত্রা, ধরন ও যুক্তি ছিলো। তা যা-ই হোক না কেন, সেই যুক্তিগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনাকারীদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রাসঙ্গিক? যারা ইসলামের জন্য পাকিস্তান রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং বর্তমানে একটি 'ইসলামী বাংলাদেশ' গড়ার জন্য কাজ করছেন, তারা যখন পরবর্তী চার মূলনীতির পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সহায়তা লাভের পথ সুগম করার জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে ঘোষিত তিন মূলনীতির ওপর ফোকাস করে বক্তব্য রাখেন, তখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক পক্ষ এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণ এতে এক ধরনের সুযোগসন্ধানী মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পান।

শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে। মধ্য-ডানপন্থী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বর্তমানে এই ধারায় রাজনীতি করছে। মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে প্রচলিত ন্যারেটিভের মোকাবেলায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসাবে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনকারী তাজউদ্দীন আহমদ কেন্দ্রিক ন্যারেটিভকে হাজির করা যেতে পারে। বর্তমানে প্রথম আলো কেন্দ্রিক বাম-সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠী যেমনটি করছেন। 'স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারা'র যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলো— এ কথা মেনে নিলেও যারা স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসাবে ময়দানে হাজির ছিলো তারা যখন ৭২ সালের চার মূলনীতিকে হঠাতে ৭১ সালের তিন মূলনীতির পক্ষে শ্লোগান দেয়, তখন তা যে মোটেও আন্তরিক কিছু নয়, বরং স্থূল রাজনৈতিক কৌশলমাত্র, তা বুঝতে উচ্চমানের গবেষক হওয়া লাগে না। আর কৌশলে একটা কিছু গছিয়ে দিয়ে কোনো দেশেই টেকসই শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ধর্মনিরপেক্ষতাসহ চার মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের সব সদস্যই কি স্বাক্ষর করেননি? যদি করে থাকেন, তাহলে বলা যায় এর মাধ্যমে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের প্রাথমিক ঘোষণাকে সংশোধন করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত কোনো ঘোষণার সাথেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ বা সমর্থন ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলো না— এই ঐতিহাসিক সত্যকে কিছুটা ঘুরিয়ে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারে'র মূলনীতিকে সামনে নিয়ে আসার বিষয়টি আসলে 'ইসলাম রক্ষার জন্যই মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ হয়েছে' ধরনের নতুন ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ধারণা করছি, ভালো জিনিসকে খারাপ উদ্দেশ্যে ও ভুল পদ্ধতিতে হাজির করার কারণে এই চেষ্টা সফল হবে না।

একটি দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের সময় সকল ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে সামগ্রিক অর্থে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফাঁকতালে, কোনোমতে বুঝিয়ে দিয়ে বা জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে টেকসই শাসনতন্ত্র রচনা করা যায় না। এমনকি সংবিধান সভা ডেকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমেও যদি তা করা হয়। জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' পরিবর্তনের জন্য যাদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে, তারা দেশের কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। অথচ শতকরা মাত্র ৩ ভাগ প্রতিনিধিত্বকারী কোনো স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকেও যদি উপেক্ষা করা হয়, তারা যদি পার্টিসিপেটেড ফিল না করে, তাহলে সেই শাসনতন্ত্র গণমুখী হয়েছে বলে দাবি করা যায় না। 'চেতনা' — তা যা-ই হোক না কেন — চাপিয়ে দিয়ে দেশ ও জনগণের সত্যিকারের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভ হয় না, হতে

পারে না। যাদের মন-মস্তিষ্কে সদা-সর্বদা সর্বাত্মকবাদের ভূত চেপে থাকে, তারাই ইতিহাসের খণ্ডিত উদাহরণ টেনে অসঙ্গতিপূর্ণ যুক্তির বাতাবরণ তৈরি করে। শাসনতন্ত্রের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত হতে গণমানসের পাঠ ও সামাজিক-মনস্তত্ত্বের স্বীকৃতিও জরুরি। জনগণের জাতীয় ঐক্যমত্যের ওপর নির্ভর করেই উন্নত দেশ ও জাতি গঠন সম্ভব হতে পারে। শাসনতন্ত্র হলো ইতোমধ্যেই অর্জিত এই ঐক্যমতের লিখিত রূপ।

অতএব, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো সার্বজনীন মূল্যবোধের ওপর একটি জাতি ও রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে হলে এসব বিষয়কে যে কোনো ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। নতুন করে বিশ্বাস ও আস্থাযোগ্য মনোভাব, ভাষা ও পদ্ধতিতে নেহায়েত সমন্বয়ধর্মী তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা হিসাবে এসব বিষয়কে তুলে ধরতে হবে। প্রয়োজনে এসবের তাৎপর্য বহন করে, কিন্তু বিতর্ক এড়ানো যায়— এমন পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। একটি ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরকার জনগোষ্ঠীকে একটি একক রাজনৈতিকতার মধ্যে আনতে হলে ক্ষুদ্রতম ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও ভাষাগত গোষ্ঠীকেও সন্তোষজনকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এমন বিষয়কে পরিচয় হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। ইতিহাসের চলমান ঘটনার মধ্য থেকে কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে এনে যুক্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে জাতীয় রাজনৈতিক পরিচয় নির্ণয় করার প্রস্তাবনা ও প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এরচেয়ে বড় কথা হলো, জাতীয় পরিচয় নির্ধারণ করে দেয়া যায় না। উপরে বলা হয়েছে, জাতীয় পরিচয় তথা জাতীয়তা নির্ধারণ করার মানে হলো, ইতোমধ্যে বিদ্যমান ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ভাষায় রূপদান করা।

ইসলামপন্থীদের সকল পক্ষ ও চীনপন্থী কমিউনিস্টদের একাংশ কর্তৃক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করার অন্যতম যুক্তি ছিলো এই যে— ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্বায়ত্বশাসনের দাবি ছিলো, স্বাধীনতার দাবি ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৭২ সালে চার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে যে সংবিধান রচিত হয়, উপরোল্লিখিত পক্ষদ্বয় নানাভাবে এর বিরোধিতা করেছে। তাঁদের মতে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরতন্ত্র কর্তৃক জারিকৃত 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে'র অধীনে যারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদেরকে দিয়ে একটি স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান সভা নির্বাচন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তা হয়নি। আপত্তিকারীদের ভাষায়,

এটি একটি চাপিয়ে দেয়া সংবিধান। অথচ তাঁরাই আবার দাবি করছেন— সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসাবে মেনে নিয়ে নতুনভাবে সংবিধান রচনা করা হোক! এটি কি স্ববিরোধিতা নয়? নির্বাচিত সংবিধান সভা কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন করা হলেই সেটি গ্রহণযোগ্য ও টেকসই হবে— এই ধারণা ও প্রচারণাও যে সব সময়ে সঠিক প্রমাণিত হয় না তা আমরা সাম্প্রতিক মিশর পরিস্থিতি থেকে বুঝতে পারি। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যা কিছু করেছে ও করছে, তা সবই 'শাসনতন্ত্র-সম্মত'ভাবেই করেছে ও করছে। তাই না? অতএব, সংবিধান নামে লিখিত কাগজ মাত্রই সংবিধান নয়, যদি তা জনগণের রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে না হয়।

প্রতিটি জনগোষ্ঠী বা গ্রুপের স্বতন্ত্র ভাবধারা বা তত্ত্ব-আদর্শ অপর কোনো ভাবধারা বা তত্ত্ব-আদর্শের কিছু না কিছু নিজের মধ্যে ধারণ করে। সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কোনো ভাবধারা বা তত্ত্ব-আদর্শ নাই। কারণ, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই কারো না কারো সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সাধারণ ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করেই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব রাষ্ট্রসভা ও সভ্যতার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব স্ব পরিসরে গড়ে উঠে, টিকে থাকে ও বিবর্তনের ধারায় বিকাশ লাভ করে। নানা মত ও পথের জনগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রের জন্য ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা ও তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা জরুরি। জনগোষ্ঠীর এক পক্ষের ওপর দেবত্ব আরোপ এবং অপর পক্ষের ওপর দানবত্ব আরোপ (demonize অর্থে) করে কখনো দেশ ও জাতিগঠন হতে পারে না।

সুতরাং, ঐক্যমত্যের বিষয়গুলো খুঁজে বের করে তা গ্রহণ করার মতো মানসিকতা থাকা জরুরি। পেশাদার ধর্মপ্রচারকদের মতো কৃত্রিম বিনয় ও কপট আন্তরিকতা দিয়ে জাতিগঠন সম্ভব নয়। এ ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল বাহাস ও তর্কযুদ্ধ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভক্তই করবে বেশি। বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার মিশনে সফল হয়নি। সাংস্কৃতিক দিক থেকে বামপন্থা, রাজনীতিতে দ্বি-দলীয় মধ্যপন্থা ও ধর্মচেতনায় ইসলামপন্থা— এই তিন অবস্থান ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে গড়ে (shaped Bangladesh) তুলেছে। এর কোনো একটা অবস্থান দিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। তাত্ত্বিক বাম, উদার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ইসলামপন্থী— সবার জন্যই এ কথাগুলো প্রযোজ্য।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কি ইসলামের লক্ষ্য?

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার– এই তিনটি বিষয় মূলত একই দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। আলোচনার সুবিধার্থে এই তিনটি ধারণাকে বিশ্লেষণ করতে নমুনা হিসাবে আমরা সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাটিকে গ্রহণ করতে চাই। বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা একটি ‘ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক বাংলাদেশ’ই চান, তা যে আঙ্গিকেই হোক না কেন। সেক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ মনে করতে পারেন, বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (১৭ এপ্রিল, ১৯৭১) ‘অপরপক্ষ’ কর্তৃক সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো বিধায় এ সবের আবরণে এদেশে ইসলামী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ কার্যকর কৌশল হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটেই বর্তমান আলোচনা। আগের নিবন্ধে এর রাজনৈতিক দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এবার এ ধরনের শাশ্বত মূল্যবোধগুলোর প্রয়োগযোগ্যতার ইসলামী প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করা হবে।

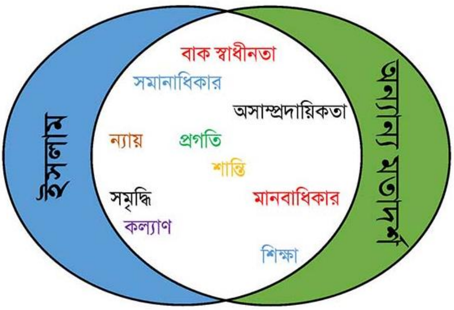

ইসলামকে যদি আমরা একটি বৃত্ত হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে এর ভেতরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের ধারণাসহ এ ধরনের আরো অনেক বিষয় রয়েছে। সাম্যবাদ তথা কমিউনিজমের মধ্যেও এ বিষয়গুলো আছে। অন্যান্য মতবাদের মধ্যেও এসব বিষয় আছে। এগুলো সদা-সর্বদা তিনটিই হবে, এমন কথা নাই। যে কেউ চাইলে মৈত্রী, স্বাধীনতা, কল্যাণ ইত্যাদি শব্দগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। আমরা জানি, সংবিধান বা এ

ধরনের মৌলিক কোনো দলীলে ব্যবহৃত শব্দাবলির আক্ষরিক অর্থের চেয়ে এর দ্যোতনাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, এ ধরনের শাশ্বত মূল্যবোধসমূহের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও জাতি গঠন হতে পারে। আবার, কোনো রাষ্ট্র ও জাতিই যেহেতু এগুলোকে অস্বীকার করে না, সেহেতু নিছক এসব ব্যাপক অর্থবোধক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পৃথিবীর নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও জাতি গঠনের বিশেষত্ব কী— সেই প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক।

সাম্য ও ন্যায়বিচারের চেতনাকে মূলনীতি বিবেচনা করে অন্যান্যদের সাথে ইসলাম অনুসারীদের সাধারণ রাজনৈতিকতায় (polity) অংশগ্রহণ করা কিংবা না করার বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। পথিমধ্যে একত্রিত হওয়া যাত্রীদের দৃশ্যমান ঐক্যবদ্ধতাকে তাদের যাত্রা ও গন্তব্যের একত্ব হিসাবে মনে করা যে ধরনের ভুল, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকেই ইসলামের লক্ষ্য মনে করাও তেমন ধরনের ভুল। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে ইসলাম কিংবা সেক্যুলারিজম বা কমিউনিজমের দোহাই দিয়ে আমরা যা কিছু অর্জন করতে চাচ্ছি, উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত রাষ্ট্রগুলোতে কম-বেশি তার সবই ইতোমধ্যে বিদ্যমান। বৈষয়িক এসব উন্নতি অর্জনই ইসলামের লক্ষ্য— এমন দাবির মর্ম মোতাবেক, পাশ্চাত্য দেশগুলো এক একটি উন্নততর বা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত মানের বেনামী ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ বটে! তা না হলে চতুর সমাজতন্ত্রীদের প্রচারিত এ কথাই মেনে নিতে হয় যে ইসলামে রাষ্ট্রধারণা বলতে কিছু নাই বা আধুনিক রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনায় ইসলাম প্রসঙ্গ একটি বাহুল্য বিষয়মাত্র। (কৃষি = শষ্য) – (কৃষি + প্রার্থনা = শষ্য); অতএব, প্রার্থনা = শূন্য— কতিপয় বস্তুবাদী-সাম্যবাদীর এই অদ্ভুদ সমীকরণের মতো করে ইসলামও গুণগত দিক থেকে শেষপর্যন্ত ‘শূন্য’ হয়ে দাঁড়ায়; যদি জনপ্রিয় ও প্রচলিত অর্থে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে ইসলামের লক্ষ্য হিসাবে মনে করা হয়।

কোনো কিছুর মধ্যে কোনো কিছু থাকা মানেই সেটি সেই জিনিস হওয়া নয়। যেমন, বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারী সন্তানের মা হয়। তা সত্ত্বেও ‘সন্তান থাকা’ কোনো নারীর বৈবাহিক সম্পর্কের প্রমাণ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করা। তারমানে এই নয় যে সনদধারী মাত্রই জ্ঞানী। এই ধারায় আলোচনা করলে দেখা যাবে, কোনো কিছুর মধ্যে কিছু একটা থাকা মানেই কিন্তু সেটি সেই জিনিস হওয়ার প্রমাণ নয়। ইসলামের অন্যতম মৌলিক

বিষয় হলো ন্যায়বিচারের ধারণা। বলা বাহুল্য, ন্যায়বিচারের এই ধারণা জগত, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের বিশেষায়িত ধারণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। অতএব, কোনো তত্ত্ব, মতাদর্শ বা কার্যক্রমে 'ন্যায়বিচার' প্রসঙ্গ থাকার মানে তা মূলত ইসলামই— এমন মনে করাটা ভুল। উল্লেখ্য, ইসলামসম্মত হতে হলে যে কোনো কিছুকে 'ইসলাম' পরিচয়েই হতে হবে এমন কোনো আবশ্যকতা নাই। সামাজিক কার্যক্রম বা মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে বিষয়টি ইসলাম মোতাবেক হওয়াই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে কাজটি ইসলাম মোতাবেক হয়েছে বা করা হচ্ছে— এমনটি ঘোষণা করার অপরিহার্যতা নাই। বুঝা যাচ্ছে, এ ধরনের কোনো বিষয়ে কোনোক্রমেই 'ইসলাম' এর ঘোষণা দেয়া যাবে না, এমন দাবিও ভুল।

একটি বিষয়ের সাথে অপর কোনো বিষয়ের ইতিবাচক সম্পর্ক থাকার তিনটি অবস্থা হতে পারে: (১) আপতিক সম্পর্ক (occasional relation), (২) আবশ্যিক সম্পর্ক (necessary relation) ও (৩) অভিন্নতার সম্পর্ক (identical relation)। আপতিক সম্পর্কগত বিষয়ে একাধিক বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ক থাকাটা হলো প্রাসঙ্গিক। কখনো থাকতেও পারে, আবার কখনো নাও থাকতে পারে। যেমন: কাগজের সাথে কলমের সম্পর্ক বা কলমের সাথে কলমের ক্যাপের সম্পর্ক। পরীক্ষার্থীর সাথে সম্ভাব্য ফলাফলের সম্পর্ক। সংক্ষেপে, ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিকভাবে বিষয়গুলো যখন পৃথকভাবে থাকতে পারে, একটির উপস্থিতি অপরটির উপস্থিতিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ করে না, তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে বলা হয় আপতিক সম্পর্ক। আবার বিষয়গুলোর মধ্যকার সম্পর্ক যদি এমন হয় যে একটি ছাড়া অপরটি হতেই পারে না, একটি থাকা মানেই অপরটি থাকা, তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে আবশ্যিক। যেমন: হৃৎপিণ্ডের সাথে ফুসফুসের সম্পর্ক। কোনো মানবদেহ এমন হতে পারে না, যেটিতে হৃৎপিণ্ড আছে অথচ ফুসফুস নাই। অনিবার্য সম্পর্কের একটি বিশেষ ধরন হলো অভিন্নতার সম্পর্ক। বাস্তবে হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসের সম্পর্ক অপরিহার্য হলেও দুটি আলাদা অঙ্গ। কিছু কিছু অনিবার্য সম্পর্ক এমন যে তা বাস্তবে পৃথক করা সম্ভব না হলেও আদতে তা আলাদা এবং তাত্ত্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে আলাদা করা যায়। আবার কিছু কিছু অনিবার্য সম্পর্ক এমন যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বাস্তবে এবং কল্পনায় বা তত্ত্বে— কোনোভাবেই আলাদাভাবে ভাবা যায় না। আসলে অভিন্ন সম্পর্কের বিষয়গুলো একই বিষয়ের বিভিন্ন নাম বা ভিন্ন ভিন্ন দিক মাত্র।

এই নিবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গ হলো, সাম্য ও ন্যায়বিচারসহ অনুরূপ ধারণাগুলোর সাথে ইসলামের সম্পর্ক খতিয়ে দেখা। স্পষ্টতই ইসলামের সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়াদির সম্পর্ক অভিন্ন নয়, বরং আবশ্যিক। যেসব বিষয়ের সাথে ইসলামের সম্পর্ক অভিন্ন অর্থে আবশ্যিক সেগুলো (কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত) সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক উৎস কোরআন ও হাদীসে স্পষ্ট করে বলা আছে। আমরা জানি, ঈমানের ঘোষণাই হলো কালেমা। হাদীসে জিবরীল অনুসারে ঈমান হলো আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূল, আখিরাত ও তাকদীরকে সত্য বলে মেনে নেয়া। যে ইসলাম ঈমান নিঃসৃত নয়, ইসলামের পরিভাষায় তা হলো নিফাক বা কপটতা। আলাদাভাবে ইসলামের লক্ষ্য বলে কিছু নাই। এরপরও যদি এভাবে বলা হয় যে উপরে উল্লেখিত বিষয়াদি ঈমান ও ইসলামের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য; আর এর বাইরে ইসলামের একটি লক্ষ্য থাকতে পারে, যা হলো সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। দার্শনিক চিন্তার সূত্রে দাবি করা এহেন ব্যাখ্যার মৌলিক ভ্রান্তি হলো— এ ক্ষেত্রে ঈমান ও ইসলামের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের সাথে এসবের কর্মগত দিক বা দাবিসমূহকে সংশ্লিষ্ট চিন্তক এক করে ফেলেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইসলামের বাইরে ইসলামের লক্ষ্য বলে কিছু নাই। তারপরও যদি কেউ ঈমাননির্ভর ইসলামের বাইরে 'ইসলামের কোনো লক্ষ্য' আছে দাবি করেন, তাহলে বলতে হয়, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য। সাম্য, ন্যায়বিচার ইত্যাদি ইসলামের লক্ষ্য নয়; এগুলো হলো ইসলামের দাবি (necessary implication)।

সাম্য, ন্যায়বিচার এসব সম্পর্কে কার কী ধারণা— এবার তা বিশ্লেষণ করা যাক। শুরুতেই বলা হয়েছে, এসব বিষয় নিয়ে নানা রকমের যুক্তি, এমনকি বিপরীতমুখী কর্মনীতির কথা পাওয়া যায়। এসব কথা শুনতে ভালো লাগে। প্রথমেই মনে হয়, ওসব তো বাস্তবায়নের সমস্যা (not actual problem, but implementary problem)। যেন বিষয়গুলোকে সহজেই বুঝে ফেলা গেছে। আলোচনা ও বিশ্লেষণ শুরু করলে দেখা যায়, একেকজন একেকটি বিষয়কে একেকভাবে বুঝেছে। একই বিষয়ের বুঝজ্ঞানে এ ধরনের ব্যাপক তারতম্যের কারণ হলো জীবন, জগত ও বাস্তবতা সম্পর্কে একেকজনের একেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে কোরআন-হাদীসে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এগুলোকে হুবহু গ্রহণ ও অনুসরণ না করে গড়পড়তা হিসেবে বিবেচনা করা অগ্রহণযোগ্য। ইসলামের মৌলিক

বিষয়গুলোর মনগড়া ভাষ্যকে যিনি সঠিক মনে করেন, তার ধারণায় সাম্য ও ন্যায়বিচার বলতে যা, তা ইসলামের দিক হতে সংজ্ঞায়িত সাম্য ও ন্যায়বিচারের ধারণার সাথে অভিন্ন হতে পারে না। হতে পারে তার অনুসৃত 'ইসলাম-প্রসঙ্গ' একটি কৌশলগত ব্যাপার। শুভ, সাম্য, কল্যাণ, ন্যায় ইত্যাদি মৌলিক চিন্তা ইসলামের স্ব-উপস্থাপিত চিন্তাধারা হতে নিঃসৃত হওয়াটা জরুরি নয়— এমনটা কেউ মনে করলে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের মতো বিষয়গুলো আদতে বাহুল্যমাত্র (redundant) হয়ে দাঁড়ায়।

বাধ্যগত পরিস্থিতি ও কর্মগত আংশিক সাযুজ্যের ভিত্তিতে সাম্য, ন্যায়, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদি মূল্যবোধসূচক শব্দাবলিকে সামনে রেখে মানুষ একেকটি জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে। নিজ নিজ বিবেচনায় কল্যাণ লাভ থাকে এর উদ্দেশ্য। যখনই এ ধরনের ব্যাপক অর্থবোধক কোনো কথার (term) ভিত্তিতে জনগণ একত্রিত হয়, তখন তারা স্ব স্ব বিবেচনায় কিছু অভিন্ন স্বার্থগত বিষয়কে সামনে রাখে। এই আপাত ঐক্যের ভেতরে চাপা পড়ে থাকা অন্তর্গত অনৈক্যের উপস্থিতি ও বিষয়বস্তু, যা কেবল বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকাশ পায়। মানিয়ে নেয়া মানে ভিন্নতর কিছু আদৌ না থাকা বুঝায় না। সমঝোতা ও নৈতিকতা হচ্ছে মানিয়ে নেয়া বা মেনে চলা।

যাহোক, ইসলামের দৃষ্টিতে জনগণের কল্যাণই রাষ্টের লক্ষ্য। একইভাবে মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠাও রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম ইসলামসম্মত উদ্দেশ্য। এ পর্যায়ে 'মানুষ' সম্পর্কে ইসলামের যে বিশেষ ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাকে উহ্য রেখে মানুষের 'কল্যাণ' বা 'মানবিক মর্যাদা'র ধারণা অন্তত ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি? এর উত্তর যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে তা মূল্যবোধসূচক যে কোনো পরিভাষা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় ইসলামকে একটি পক্ষ হিসাবে মানতে যারা নারাজ, তারা দৃশ্যত জানেই না যে মুসলিম ফকীহ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। বিশেষ করে আল-ফারাবীর রাষ্ট্রতত্ত্ব এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন একটি ধারাবাহিকতা মাত্র। ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক— এ ধরনের বিভাজন ইসলামের দৃষ্টিতে কখনো মৌলিক হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জগত সমগ্র। জীবনও অবিরত। ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত মানুষ, জগত ও জীবনের অধিবিদ্যাগত ধারণাকে কার্যত অকার্যকর করে মানবিক মর্যাদা সংক্রান্ত কোনো সিরিয়াস

আলোচনা ও কংক্রিট কর্মধারা ইসলাম অনুসারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের একটি কঠোর (rigid) ও কর্তৃত্ববাদী নৈতিক, অধিবিদ্যক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে জগতের বাদবাকি লোকদের সাথে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কীভাবে কার্যকর সম্পর্ক সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে যারা আলোচনার এ পর্যায়ে এসে উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন বা শঙ্কাবোধ করছেন, তারা আসলে ইসলামকে ইসলামের মতো করে দেখার একাডেমিক সৎ সাহস হতে নিজেদের বঞ্চিত করছেন।

ইসলামকে জগতের সাথে মেলাতে গেলে নতজানু নীতি গ্রহণ করার মনোভাব সঠিক নয়। আবার জগতের তাবৎ 'অপরে'র সাথে লড়াই করে ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে— এ ধরনের চরমপন্থাও সঠিক নয়। এ ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বয়পন্থা কী হতে পারে, তা ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহে স্পষ্ট করা হয়েছে। কেউ সেসব মানবেন কি না, সেটি তার বিবেচনা। শাশ্বত মূল্যবোধসূচক বিষয়গুলোর রূপায়ণে ইসলাম নির্দেশিত কর্মধারা তথা শরীয়াহ'র সনাতনী কাঠামো বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য কিনা তা নিয়ে ইসলাম বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত পণ্ডিতদের পক্ষ-বিপক্ষের মতামত থাকতে পারে। আমার কথা হলো, জেনে-বুঝে যারা একমাত্র জীবনাদর্শ হিসাবে ইসলামকে অনুসরণের ঘোষণা দিয়েছেন, এ ধরনের বিতর্ক থেকে তাঁদের গ্রহণ করার কিছু নাই। যদিও জানার জন্য তা চর্চা করা যেতে পারে। ইসলামপন্থীদের করণীয় হলো, শরীয়তের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী তথা সমাজ ও রাষ্ট্রকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা। ইসলামকে কাস্টমাইজ করা যায় না, এটি যেভাবে আছে সেভাবে গ্রহণ করার বিষয়। যদিও আকীদাগত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে ইসলাম মানিয়ে নেয়ার সুযোগ রেখেছে। অতএব, কর্মনীতি গ্রহণ তথা আমলের ক্ষেত্রে ক্রমধারা অবলম্বন করা যেতে পারে।

ইসলামের ভেতরকার এই স্বগত সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিকে (inherent inclusiveness) বুঝতে না পারার কারণ হলো, শত শত বছর ধরে ইসলামকে নিছক ধর্ম হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের অনুসারী ও বিরোধী উভয় পক্ষই এই ভুলটি সমানতালে করেছে। ইসলামকে পরম সমন্বয়ধর্মী (ultra-inclusive) অর্থে অনন্য গণ্য না করে একে চরম সমন্বয়বিরোধী (ultra-exclusive) অর্থে বুঝা ও উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের মজ্জাগত

ধর্মবাদিতা (religiosity) ও ধর্মবাদিতার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে চরমপন্থার প্রতি ঝোঁকের কারণে এমন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবিক সৃষ্টিশীলতার সবটুকুই ইসলাম ধারণ করে।

ইসলামের কোনো কোনো দিক নিয়ে কিছু একটা করা বা বলা হলে তা ইসলামসম্মত হবে, এমন কোনো কথা নাই। এমনকি হতে পারে তা প্রকৃতপক্ষে বা শেষ পর্যন্ত ইসলামকেই খণ্ডন করে। এই জরুরি কথাগুলোকে তাত্ত্বিক বা জটিল আখ্যায়িত করে বিবেচনার বাইরে রাখলে সাম্য, মৈত্রী, সামাজিক ন্যায়বিচার, কল্যাণসহ শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধসমূহের ধারণা সঠিক হতে পারে না। ইসলামের মধ্যে যদি সাম্য, মৈত্রী, মানবিকতাবোধ, কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের মতো বিষয়গুলো থেকে থাকে, এগুলোর সাথে সাথে যদি আধ্যাত্মিকতা, সৃজনশীলতা ও একটি সুসংবদ্ধ (consistent) জ্ঞানতত্ত্বও থাকে, তাহলে ইসলামকে স্বয়ং একটা অনন্য ব্র্যান্ড হিসাবে মানতে ও উপস্থাপনে সমস্যা কী? ইসলাম যদি আদতে এরূপ না হয়ে থাকে, তাহলে নিজের সম্পর্কে ইসলামের দাবিগুলোর অন্তত অংশবিশেষ ভুল। ইসলাম যেহেতু নিজেকে পূর্ণ সুসংবদ্ধ সমগ্র হিসাবে (consistent as a whole) দাবি করে; সেহেতু ইসলামের বিষয়গুলোর আংশিক অকার্যকারিতা বা ভ্রান্তি উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত দাবি আদতে ইসলামকেই খারিজ করে। কোনো কোনো রাষ্ট্রচিন্তক ইদানীং তাই করছেন। জ্ঞান-গবেষণা বাদ দিয়ে ইসলাম কায়েমে আগ্রহীদের অনেকেই না বুঝে এতে সায় দিচ্ছেন।

'ইসলামী রাষ্ট্র' ধারণার সমর্থন বা পর্যালোচনা এই আলোচনার বিষয় নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য—এ ধরনের বক্তব্যের সারবত্তা পরখ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। মুসলিম হিসাবে কেউ ন্যূনতম শতকরা আড়াই টাকা যাকাত হিসাবে দিবে। অমুসলিম কেউ 'সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি'র অংশ হিসাবে ন্যূনতম শতকরা আড়াই টাকা দান করতে পারে। বাস্তবে তা একই হলেও মূলত তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইবাদত হিসাবে মুসলমানেরা যা করে সেসবের সুনির্দিষ্ট অনুধ্যানমূলক ফলাফল (meditative effect) আছে। ঈমান ও ইসলামের সুনির্দিষ্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে অন্তর্গতভাবে গ্রহণ না করেও ধর্মীয় শব্দাবলি ও প্রক্রিয়াসমূহকে ব্যবহার করে বা না করে, যে কোনো প্রাসঙ্গিক উপায়ে কেউ ব্যক্তিত্ব-উন্নয়নমূলক ও মনোদৈহিক উৎকর্ষদায়ক অনুধ্যান (contemplation) করতে পারে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইবাদতের মতো করে কিছু সুনির্দিষ্ট ফল লাভ করবে,

উপকৃত হবে, এমনকি কমবেশি আধ্যাত্মিক উন্নতিও লাভ করতে করবে। বাস্তবে ব্যাপারটা যদি এই হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে কি এ কথা বলা সঙ্গত হবে যে ইবাদত ও মেডিটেশান একই জিনিস? ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে এর উত্তর না-সূচক। যদিও ইবাদতের মাধ্যমে মেডিটেশানের কাজ হয়, এটি সত্য।

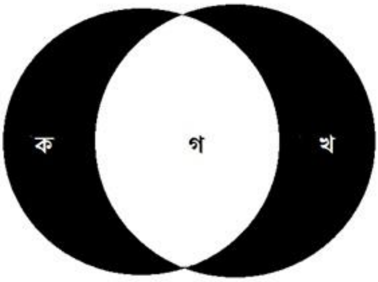

ইসলাম ও অপরাপর মতাদর্শের আন্তঃসম্পর্ককে পাশের চিত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 'ক' বৃত্তের অংশবিশেষ 'খ' বৃত্তের অংশবিশেষের উপর দিয়ে গেছে। আর যেটুকু উভয় বৃত্তের অংশ, তা হলো 'গ'। এখন 'ক'-এর সাথে 'খ'-এর সম্ভাব্য সমন্বয় হতে পারে 'গ'-এর মাধ্যমে। 'ক' তার 'গ' অংশে আসলে কার্যত তা 'খ' অংশে আসা হলো। আবার 'খ' যখন তার 'গ' অবস্থানে আসে তখন সে তার নিজ অবস্থানেই থাকে, যদিও কার্যত তা সমভাবে 'ক' অংশেরও অবস্থান। নানা রকমের মত-পথের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিকতাসহ নানা ধরনের ঐক্যের এটিই একমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়। এর ভিত্তিতে 'ক' আর 'খ' আসলে একই জিনিস— এমন দাবি করাটা যেমন অগ্রহণযোগ্য; তেমনি সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার ধারণা ইসলামের অন্তর্নিহিত মর্মবাণীর অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য— এই দাবিও ভুল। সংখ্যাগরিষ্ঠ, ধর্মনিষ্ঠ, সরলপ্রাণ ও ক্ষেত্রবিশেষে হীনমন্য ইসলামপন্থীদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য সহজিয়া-সাম্যবাদীদের কেউ এ ধরনের 'তর্ক তুলতে' পারে। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংশ্লিষ্ট নোশনগুলোকে বিশ্লেষণ করলে এহেন উদ্দেশ্যপূর্ণ কথাবার্তার আড়ালের বড় বড় ফাঁকগুলো ধরতে ও বুঝতে পারা তেমন কঠিন নয়। ইসলামপন্থীরা ভৌগোলিক-নৃতাত্ত্বিক জাতি ও রাষ্ট্রগঠনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সাম্য, কল্যাণ, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের মতো ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়সমূহকে ধারণ করবে বা করতে পারে। এর মানে এই নয় যে এসব হলো ইসলামের লক্ষ্য। এ ধরনের পরিভাষাসমূহ অর্থপূর্ণতার দিক থেকে একই সাথে বহু অর্থবোধক ও সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক।

ইসলামকে ইসলামের ভিতর থেকে বুঝা ও উপস্থাপনের চিন্তাপদ্ধতিকে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণ বা বর্জনের বিষয় ভিন্ন ব্যাপার। কোদাল দিয়ে আপনি মাটি কাটেন বা অন্য যাই করেন, কোদাল যে কোদাল বৈ অন্য কিছু নয়, তা তো স্বীকার করতে হবে। তাই না? পৃথিবীতে কোদালের কোনো সার্বজনীন মাপজোক নাই। তা সত্ত্বেও আমরা 'কোদাল' শব্দটি ব্যবহার করি, এর অর্থ বুঝতে পারি। মাথায় কী পরিমাণ চুল না থাকলে 'টাক মাথা' হবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকা সত্ত্বেও 'টাক-মাথা' শব্দটি দুনিয়ার সব ভাষাতেই সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণতা সহকারেই ব্যবহৃত হয়। ইসলামকে ধর্ম হিসাবে গণ্য করাটা যে ভুল, তা স্পষ্ট করতে আমরা এ পর্যায়ে শব্দের (term অর্থে) অর্থ নির্ণয়ে Vagueness (বহু অর্থবোধকতা) এবং precision (সুনির্দিষ্টতা) নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। শুরুতে মনে হতে পারে, মাত্র কতিপয় শব্দ বহু অর্থবোধক, বাদবাকিগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে প্রায় সব শব্দই এক অর্থে vague। precision আরোপ করার জন্য সাধারণত কোনো একভাবে (arbitrarily) একটি পরিমাণকে নির্ধারণ (quantification) করা হয়। ভাষাদর্শনে একে precision through quantification-এর নীতি বলে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে যত ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে, তার কারণ হলো vague শব্দটির অনুবাদ করা হয় 'দ্ব্যর্থবোধক' বা 'অস্পষ্ট'। এক এক (one to one) অর্থের পরিবর্তে যে শব্দ বহু অর্থবোধক, তা vague। প্রত্যেক শব্দই কোনো অর্থে vague, আবার কোনো অর্থে precise। কার্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দটির কোন্ অর্থটি গ্রহণ করা হবে তা প্রেক্ষাপটই নির্ধারণ করে দেয়।

কোরআন-হাদীসে আল্লাহর কাছে ইসলামকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য 'দ্বীন' বলা হয়েছে। 'দ্বীন' নামক এই পরিভাষাটিকে বাংলায় 'ধর্ম' হিসাবে অনুবাদ করাটা ভুল। এর ফলে ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণাসমূহ অনেকে ইসলামের ওপরও প্রযোজ্য মনে করছেন। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্রসমূহের কত সংখ্যক বা শতাংশ ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মনে করছে বা করেছে তারচেয়ে বরং ইসলাম স্বয়ং এ বিষয়ে কী বলে তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম যে ধর্মমাত্র নয় তার প্রমাণ হলো এতে রয়েছে ধর্মের আওতাবহির্ভূত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। ইসলাম বরং ধর্মের নামে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কিছু বিষয়ের বিরোধিতা করে। অবশ্য কোনো বিষয়ের আলোচনায় অন্য কোনো বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আসার কারণে বিষয়টি একইসাথে দুটিকেই প্রতিনিধিত্ব করে না। ধর্মের আলোচনায় অর্থনীতি বা রাজনীতির কোনো প্রসঙ্গ আসলে সংশ্লিষ্ট

ধর্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা একইসাথে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে গণ্য হবে না। এ বিষয়ে ইসলামকে বিষয়গতভাবে বুঝার চেষ্টা করলে দেখা যাবে, ইসলামে ধর্মের আওতাবহির্ভূত বিষয়গুলো ধর্ম সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসাবে আসে নাই। বরং মতাদর্শগত প্রতিটি বিষয় একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে আলোচিত হয়েছে। নিছক একাডেমিক দৃষ্টিতে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক তত্ত্বে কী কী থাকা দরকার তা ঠিক করে ইসলামে সেগুলো আছে কিনা, থাকলে কীভাবে আছে, এসব যাচাই করলে এটি প্রতীয়মান হবে যে ইসলামের রয়েছে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব। এই দৃষ্টিতে ইসলাম একটি রাজনৈতিক মতবাদ বটে। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শনসহ বিভিন্ন মতাদর্শগত তাত্ত্বিক বিষয়ে একই বিষয় পরিলক্ষিত হবে। ইসলামে এ ধরনের দিকগুলো (aspects) অভিন্নও নয়, বিচ্ছিন্নও নয়। ইসলামই একমাত্র মতাদর্শ যাকে একটি বেসিক টেক্সট দ্বারা আইডেন্টিফাই করা যায়। বাদবাকি বিষয়গুলো, যেমন হাদীস ইত্যাদি উক্ত মূল পাঠ্যগ্রন্থেরই পদ্ধতিগত সম্প্রসারণমাত্র। একটি অনন্য জীবনাদর্শ হওয়ার কারণে ইসলাম একইসাথে ধর্ম, রাজনীতি, দর্শনসহ মানবজীবনের সব দিককে সমন্বিতভাবে ধারণ করে। এর কোনো একটিকে অন্য কোনোটির বিকল্প হিসাবে হাজির করা হলে, তা আর যাই হোক ইসলাম হবে না।

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি মৌলিক তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে দ্বি-বিভাজন (binary) ও দ্বান্দ্বিক কাঠামোতে চিন্তা করে। হয় এটি, নয় ওইটি। এক কথায় পাশ্চাত্য চিন্তার ধরন হলো মুখোমুখি (horizontal)। প্রাচ্য চিন্তাধারার, বিশেষ করে ইসলামে চিন্তার প্যাটার্ন হচ্ছে ক্রমসোপানমূলক (vertical or hierarchical)। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা হিসাবে দুটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দাবি করছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক এ রকমের কোনো বিভাজন নাই। ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হতে স্বাধীন দার্শনিক সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর নিয়ে ইতোপূর্বে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

অখণ্ড 'দ্বীন' হিসাবে ইসলামকে ইসলামের মতো করে বুঝলে এটি স্পষ্ট, ইসলাম মানে সাম্য বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নয়। অথচ সাম্য ও ন্যায়বিচারসহ এ ধরনের মূল্যবোধগুলোর সর্বোত্তম রূপায়ণে ইসলাম যেসব কর্মপন্থার কথা বলে, তা এসব বিষয় সম্পর্কিত অন্য যে কোনো মতবাদ তথা চিন্তাকাঠামোর তুলনায়

অধিকতর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম উপস্থাপিত প্যারাডাইমের ভিত্তি হলো তাওহীদের ধারণা। এর অনুবর্তী হলো আল্লাহর বান্দা হিসাবে মানুষের পরিচয়। মানুষের পরিচয় হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। অতএব, মানুষ এই বিশ্বে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। বিশ্বজগত পরিচালনায় মানুষ যেসব উপায়ের (means or tools) সাহায্য গ্রহণ করে তার অন্যতম হলো সাম্য ও ন্যায়বিচারের ধারণা। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, এ ধরনের শাশ্বত মূল্যবোধসূচক আরো অনেক শব্দ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো একই ধারণার বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বাস্তবায়ন কীভাবে করতে হবে তা ইসলামী শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ইসলাম বাদে দুনিয়ার অন্য কোনো মতাদর্শের একক কোনো উৎস গ্রন্থ নাই। তাই ইসলামী শরীয়তসহ এই আলোচনায় উদ্ধৃত সব পরিভাষা ও বিষয়কে বিষয়ানুগ (thematic) পদ্ধতিতে বুঝতে হবে। অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসে যা কিছু আছে সে মোতাবেক ইসলামকে বুঝতে হবে। সমর্থন করা বা না করার বিষয়টি ভিন্ন। হিস্টরিকেল এপ্রোচে ইসলামকে বুঝতে চাওয়াটা ভুল পদ্ধতি। অবশ্য বিষয়ানুগ আলোচনার সেকেন্ডারি সোর্স হিসাবে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

যা হোক, ক্রমসোপানমূলকভাবে দেখলে লক্ষ্য ও উপায়ের (end and means) এই আপাত দ্বন্দ্বের নিরসন সম্ভব। সাম্যের ধারণা হলো মানবিক মর্যাদাবোধের ফলশ্রুতি। অন্যদিকে, সাম্য ধারণার দাবি হলো ন্যায়বিচারের ধারণা। ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে আল্লাহর হুকুম পালন অর্থে বুঝতে হবে। আল্লাহর হুকুম পালনই ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই ধারায় বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিশেষ কোনো কাজকে উপায় ও লক্ষ্য হিসাবে ভাগ করার পর যা এই কাজের লক্ষ্য তা-ই আবার উচ্চতর বা বৃহত্তর কোনো কিছুর উপায়। আবার সেই উপায়েরও একটি লক্ষ্য থাকে। পুরো বিষয়টিকে ইসলামী ওয়ার্ল্ডভিউতে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ-সমগ্র হিসাবে (consistent) উপস্থাপন করা হয়েছে।

কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব-২)

(৩) মজহারপন্থা

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে জামায়াতের সংস্কারবাদীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফরহাদ মজহারের দ্বারা প্রভাবিত। এই কথাটা বুঝতে হলে এবং এর বিপদ সম্পর্কে আন্দাজ করতে হলে নিচে উল্লেখিত কিছু বিষয়কে ভালো করে বুঝতে হবে।

জামায়াতের মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা গড়ে না উঠার কারণ

শুনতে খারাপ লাগলেও জামায়াতে ইসলামীতে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে মাওলানা মওদূদীই শেষ কথা। এত বছর পরেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। মাওলানা মওদূদীর আশেপাশে উনার সমকক্ষ কোনো বুদ্ধিজীবী বা আলেম শেষ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে টিকে নাই। এর দায়দায়িত্ব কার কতটুকু সেটি ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়।

মাওলানা মওদূদী নিজের লেখালেখি তথা বুদ্ধিজীবিতাকে জামায়াতের সংগঠন থেকে আলাদাভাবে বিবেচনার কথা বললেও 'সংগঠনের বাইরে সাংগঠনিক বিষয়ে কথা বলা যাবে না' নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ধারা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীর মূল এন্টারপ্রাইজ হলো ইসলাম। তাই জামায়াতের আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই 'সাংগঠনিক' বিষয় শেষ পর্যন্ত ইসলামের কোনো না কোনো বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সাথে রিলেটেড হয়ে পড়ে। কান টানলে মাথা আসার মতো। তাই শিয়াদের 'তাকিয়া' তথা গোপনীয়তা ও চেপে যাওয়ার প্র্যাকটিক্যাল উসূলের কারণে জামায়াতের মধ্যে আজ পর্যন্ত স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি গড়ে উঠে নাই। কড়ই গাছের মতো ক্রমাগত তা বেড়ে উঠেছে বটে কিন্তু ওতে ফলজ গাছের মতো কোনো ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় নাই। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থায় তা না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জামায়াতে ইসলামীতে মেধাসম্পন্ন লোকের অভাব নাই

জামায়াতের এই বুদ্ধিবৃত্তিক শুন্যতার মানে এই নয় যে, জামায়াতে তেমন মেধাবী লোকেরা জয়েন করে নাই। বরং বাস্তবতা হলো এর উল্টো। এ দেশের শিক্ষিত ও মেধাবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছাত্রজীবনে শিবির করেছে। বর্তমানে উপায়ান্তর না পেয়ে জামায়াতের সাথে লেগে আছে। কেউ কেউ পরিণত বয়সে হয়তোবা নাজাতের চিন্তায় ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন হিসাবে জামায়াতের রুকনিয়তও নিয়েছেন। তো কথা হলো মেধা বা বুদ্ধি থাকা মানেই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া নয়। বুদ্ধি থাকলেই, মেধাবী হলেই বুদ্ধিবৃত্তি ডিভেলপ করে না।

বুদ্ধিবৃত্তি একটা চর্চার ব্যাপার

চর্চা না থাকলে একজন মেধাবী ব্যক্তিও কোনো বিষয়ে পোলাপানে মতো (adolescent) কথাবার্তা বলতে পারে ও আচরণ করতে পারে। আশেপাশে আমরা এর প্রচুর নজির দেখি। শান না দিলে ইস্পাতের ছুরিও যেমন ভোঁতা হয়ে যায় স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ও বুদ্ধিবৃত্তিও তেমনি নিরবচ্ছিন্ন চর্চার ব্যাপার। নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক দীনতাকে ঢাকার জন্য যে কোনো ব্যক্তি প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য, হালকা মানসিকতার (subtle-minded) হতে বাধ্য। এমন ধরনের ব্যক্তিবর্গ নিজেরা নিজেরা এক একটা বলয়ের মধ্যে (comfort zone) নিজেদেরকে সদাসর্বদা গুটিয়ে রাখে। কমিউনিটি ক্যারেকটারের পরিবর্তে cult system-ই তাদের কাছে অধিকতর স্বস্তিদায়ক। এই দৃষ্টিতে জামায়াতের মতো জামায়াতের সংস্কারবাদের ধারাও দিন শেষে একটা কাল্ট সিস্টেমই বটে।

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জনপরিমণ্ডলে ইসলামপন্থীদের অবস্থান

দেশের ইসলামপন্থী ধারা, মত, পথ ও সংগঠনসমূহের বিশেষ করে জামায়াতের এই সাংগঠনিক রেজিমেন্টেড সিস্টেমের কারণে দেশের মূলধারার বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ইসলামপন্থা একটা হীনমন্য ধারা। এপলোজেটিক এন্ড রিএকশনারি। এ দেশের বুদ্ধিবৃত্তির মূলধারা তথা জনপরিমণ্ডল (public intellectual sphere) বলতে যা বুঝায় তা একচ্ছত্রভাবে বামপন্থা দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

কেন এমন প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হলো

ইসলামপন্থীদের মতো বিপ্লব আমদানী করতে গিয়ে ঐতিহাসিকভাবে এ দেশের বামধারা ইসলামপন্থীদের সাথে একটা বিরোধে লিপ্ত হয়ে আছে। এর

পরিণতিতে তারা এ দেশের ধর্মীয় অংগন হতে বিতাড়িত হয়ে নাস্তিকতার 'গ্লানিময়' পরিচয়কে আজো বহন করে বেড়াচ্ছে। সমাজের মূলধারা হতে বিতাড়িত হয়ে তারা সমাজ ব্যবস্থার আশপাশ তথা পেরিফেরিগুলোতে অবস্থান মজবুত করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। যার ফল হলো সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম তথা দেশের পাবলিক স্ফিয়ারে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। যাদেরকে ঘর হতে বের করে দেয়া হয়েছে তারা আশেপাশের সব রাস্তা দখল করে নিয়েছে— এমন এক অভাবনীয় পরিস্থিতি!

ফরহাদ মজহার ও বামধারার সংস্কারবাদ

বাংলাদেশের বামধারায় ফরহাদ মজহার ব্যতিক্রম। এক দৃষ্টিতে তাকে বামধারার সংস্কারপন্থী বলা যায়। তাঁর থিসিস হলো, বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশে প্রভাবশালী ধর্ম, ধর্মীয় শক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে আস্থায় নিয়ে, সাথে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এর গত্যন্তর নাই। সোজা কথায়, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাম্যবাদকে বিজয়ী করতে হলে ইসলামকে কৌশলগত দিকে থেকে ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন লেখায় তিনি তা বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, মজহারের ইসলাম-এজেন্ডা আর ইসলামপন্থীদের ইসলাম-ভাবনা এক জিনিস নয়।

'ইসলামী আন্দোলন' হিসাবে ইসলাম বনাম 'সাম্যবাদী-সহজিয়া ইসলাম'

অন্যদিক থেকেও ফরহাদ মজহারের ইসলাম আর ইসলামপন্থীদের ইসলাম এক নয়। মজহার সাহেবের ইসলামপ্রিয়তায় ইসলাম ততটুকুই আছে যতটুকু বাংলাদেশে লোকধর্ম হিসাবে প্রচলিত আছে। স্বভাবতই তার মধ্যে টেক্সচুয়্যাল অথেনটিসিটি বা আকীদাগত শুদ্ধতার কোনো ব্যাপার নাই। অশুদ্ধতার কোনো প্রযোজ্যতা নিয়েও তাই তার কোনো টেনশান বা কনসার্ন নাই। যদ্দুর দেখেছি জামায়াতের সংস্কারবাদীদের প্রিয় 'ফরহাদ ভাই'য়ের ফিলোসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা তার মূল 'আকীদা' হলো বাউলতত্ত্ব। নদিয়ার নবপ্রাণ আখড়া হলো উনার মক্কা-মদীনা। নদিয়ার ভাবান্দোলন তথা লালনের দর্শনই উনি ইসলামপন্থীদেরকে গিলাতে চান। উনি এক 'সহজিয়া ইসলামে'র প্রচারণায় নিবেদিত প্রাণ।

ফরহাদ মজহারের লন্ডন বক্তৃতার পরবর্তী কাহিনী

এ ধরনের একজন ব্যক্তির নিকট হতে কীভাবে ইসলামী আন্দোলনের ধারণা

পোষণকারীরা ইসলাম বিষয়ক বুঝজ্ঞান লাভ করতে আসে, তা আমার আক্কলে ধরে না। বছর দেড়েক আগে ফরহাদ মজহার লন্ডনে গিয়ে ইসলামিস্টদের বিভিন্ন সমাবেশে নানা রকমের ইসলাম-জ্ঞান বিতরণ করেছেন। এতে তাঁর 'সহজিয়া-সাম্যবাদী ইসলামের' কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা হাজির করেছেন। যার মধ্যে আছে— (১) ইসলামের ধর্মীয় ব্যাখ্যার পাশাপাশি একটি মুক্ত দার্শনিক ব্যাখ্যাও থাকতে হবে। (২) ব্যক্তি নয়, সমাজই ইসলামে মূল বিষয়। (৩) সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য। (৪) অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।

এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথাবার্তা শুনে উপস্থিত ইসলামপন্থীদের উদ্বেলিত করতালি দেখে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত! পরিচিত মহলে এসব বিষয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরে জামায়াতের কিছু মজহারপন্থী-সংস্কারবাদী উপর্যুপরি অনুরোধের মাধ্যমে আমার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলেন, যাতে আমি তাঁর বক্তব্যের আপত্তিযোগ্য দিকগুলো নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমি 'ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর', 'ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পার্থক্য, 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার' এবং 'সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কি ইসলামের লক্ষ্য?' শীর্ষক মৌলিক, বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা প্রবন্ধ লিখি। দুর্ভাগ্য হলো, পরবর্তীকালে ওসব মুহতারামের সাথে কথাবার্তায় আমি বুঝতে পারলাম, তারা এগুলোর কোনোটাই পড়েন নাই। এটি 'নিজেদের' লোক সম্পর্কে উনাদের হীনমন্যতাসুলভ তুচ্ছজ্ঞান ও হালকামিসুলভ মানসিকতার পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। আমার লেখার সাথে এনগেজ হলে না জানি মজহারভক্তি টুঁটে যায়...!

কে কার টার্গেট

যথেষ্ট বিত্তশালী অথচ সাম্যবাদী (?) ফরহাদ মজহারের পিকনিক স্পটে যাতায়াতকারী জামায়াতের সংস্কারবাদী সোশ্যাল এলিটদের দৃষ্টিতে ফরহাদ মজহার হলেন উনাদের 'দাওয়াতী টার্গেট'। আমি উনাদের মধ্যকার সিনিয়রদের কাউকে কাউকে বলেছি, কে ভিকটিম, কে প্রিডেটর, কে কার টার্গেট সেটি সময়ই বলে দিবে। বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ধরন হিসাবে মজহারপন্থাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে জামায়াতের মূলধারা ও সংস্কারবাদী ধারা মোটের ওপর দৃশ্যত একমত। উভয়ের মতে, এটি একাধারে একটা সরকারবিরোধী কৌশলও

বটে। যে কারো সাথে স্ট্র্যাটেজিক রিলেশন গড়ার ব্যাপারে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। এটি সত্য। সমস্যা হলো অসতর্ক ও/বা অতি সরল স্ট্রেটেজিক রিলেশন শেষ পর্যন্ত নিছক কৌশলগত সম্পর্ক হতে মতাদর্শগত সম্পর্কে গড়ায়। এটি আমরা বারে বারে দেখতে পাই। ফরহাদ মজহারের সাথে জামায়াতের সম্পর্কের ব্যাপারেও সেটি ঘটেছে। ফরহাদ মজহারের শক্তিশালী লেখনীর জোয়ারে দুর্বল জামায়াত-বুদ্ধিবৃত্তি কবে যে তলিয়ে গেছে তা তারা বুঝতে পারছেন না।

ফরহাদ মজহারের মতাদর্শগত লেখাগুলোকে প্রমোট করার কারণ কী

কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউলধারার সাথে ফরহাদ মজহারের বিশেষ মতাদর্শিক সম্পর্ক দৃশ্যমান। নদিয়াকেন্দ্রিক এই ভাবান্দোলন নিয়ে ২০০৭ সালে জামায়াতপন্থী দৈনিক নয়া দিগন্তের মাসিক ম্যাগাজিন অন্যদিগন্তে তিনি ধারাবাহিকভাবে লেখা শুরু করেন। ২০০৮ সালে তাঁর 'ভাবান্দোলন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'ধর্মের পর্যালোচনা ও বাংলাদেশে ইসলাম' শিরোনামে তিনি দৈনিক নয়া দিগন্তে দশ পর্বের একটা ধারাবাহিক লিখেছেন। দেখা যাচ্ছে, ফরহাদ মজহারের সরকারবিরোধী কলাম ছাপাতে ছাপাতে জামায়াত তার একান্ত মতাদর্শগত লেখাগুলোও নিজেদের দলীয় বলয়ের গণমাধ্যমে ছাপিয়ে চলেছে। দৈনিক আমার দেশ প্রত্যক্ষভাবে জামায়াতের পত্রিকা না হলেও এতে ফরহাদ মজহারের 'তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে...' শিরোনামের দু'পর্বের লেখা ছাপানোর বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়। জামায়াতের এমনকি শিক্ষিত-সংস্কারবাদীদেরকেও এসব লেখা গোগ্রাসে গিলতে দেখেছি। 'মজহার সাহিত্য' নিয়ে জামায়াতের সংগঠনবাদী ও সংস্কারবাদী উভয়পক্ষের কূপমণ্ডূকতা ও হীনমন্যতার গভীরতা দেখে অবাক হয়ে গেছি। অথচ 'অন্যদিগন্তে'র কোনো এক সংখ্যায় তিনি স্পষ্ট করেছেন বলেছেন— আল মাহমুদের মতো ফরহাদ মজহারও একদিন ইসলামপন্থী হয়ে উঠবেন বলে যারা ভাবছেন, তা ভুল।

তবুও জামায়াত-শিবিরের দিকভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গ মজহারের পাঠচক্রে গিয়ে বসে থাকেন। বউপোলা ও ভাইবেরাদরদেরকেও তাশকিল করে নিয়ে যান। সেখানে যখন আলোচনা সূত্রে মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামী রাষ্ট্র' চিন্তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করা হয়, তখনও তারা নীরব থাকেন। এক শীর্ষ শিবির নেতার কাছ হতে এটি শোনা। আমার সাথের একজন উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তিনি মাওলানাকে এভাবে খারিজ করে দিচ্ছিলেন তখন কি আপনার খারাপ লাগেনি? আপনি কিছু বলেছেন? উত্তরে সেই উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল নিশ্চুপ ছিলেন।

সাংগঠনিক পরিবেশে মুক্ত আলোচনার সুযোগ না থাকা একটা কারণ

সাংগঠনিক পরিবেশে কথা বলা যায় না, সেজন্য উনারা চিন্তা পাঠচক্রে যান। কেন সলিমুল্লাহ খানের 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা'তে উনারা যান না? কারণ, সেখানে ততটা পাত্তা পান না, এছাড়া আর কী? মজহার যে ইসলামপন্থীদেরকে খাতির করেন, তা তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য। সত্য-মিথ্যার মাখামাখি অবস্থার চেয়ে নির্জলা ও প্রকাশ্য মিথ্যা মোকাবিলার দিক থেকে ভালো ও সুবিধাজনক— এ কথাটা জামায়াতের সংগঠনবাদীরা তো বটেই, 'এনলাইটেন্ড' সংস্কারবাদী 'বুদ্ধিজীবীরা'ও বুঝেন না। দুঃখ!

যোগাযোগে সমস্যা নাই, সমস্যা হলো দিলখোলা মেলামেশায়

হাদীসের মর্ম অনুযায়ী, এমনকি আমাদের কাণ্ডজ্ঞান দিয়েও আমরা বুঝি, মানুষ আপন মনে করে যার সাথে উঠাবসা করে একসময়ে সে তার মতোই হয়ে যায়। অন্তর হলো জীবন্ত হাড়ের মতো। সংস্পর্শে থাকলে তা জোড়া লাগবেই। ভুলভাবে হোক, শুদ্ধভাবে হোক। কমিউনিজম বুঝার জন্য, সামাজিক উদ্যোগকে জানার জন্য, অন্ততপক্ষে কী হয় তা দেখার জন্য কখনো যাওয়া যেতে পারে। এমনকি আধুনিক তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নিয়মিত অংশগ্রহণও হতে পারে। আমিও নাস্তিক, আধা-নাস্তিক বহু বুদ্ধিজীবীর কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে থাকি। আমার বাসার বৈঠকখানা ও সিএসসিএসের কক্ষগুলো শুঁকলে এ রকম তাত্ত্বিকদের সিগারেটের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। আমি তাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তারাও আমার মতাদর্শিক অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

সমস্যা হলো বামপন্থী লোকজনের কাছে প্রত্যাখ্যাত 'ঈমানদার-কম্যুনিস্ট' ফরহাদ মজহারের চারিদিকে এখন জামায়াত-শিবিরের লোকেরাই ভীড় করে আছে। উনার মতো একজন দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীর খামার ও অবকাশ যাপনকেন্দ্রে গিয়ে উনার সাথে ছবি তুলতে পারাকে জামায়াতের তাবৎ হীনমন্য লোকেরা বিরাট প্রাপ্তি মনে করে। দাওয়াতী টার্গেট শুধু ফরহাদ মজহারকে কেন? সলিমুল্লাহ খান, আনু মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আবু সায়িদ এবং এ ধরনের বাদবাকিরা কেন নয়? জামায়াতের সংস্কারবাদীরা ইনস্ট্রাক্টর অর্থে শিক্ষক আর অভিভাবক (মেন্টর বা গাইড) অর্থে শিক্ষকের পার্থক্যটাই বুঝে না।

মাল্টি-লেয়ার ডিফেন্স

ফরহাদ মজহারের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি তাঁর

বক্তব্যকে নানা স্তরে সাজিয়ে কথা বলেন। আসল কথাটা খুব পরিষ্কার করে ও দায়দায়িত্ব নিয়ে বলেন না। পাঠক যখন কোনো একটা পয়েন্টে দ্বিমত পোষণ করে তখন তিনি তাঁর উক্ত লেখারই অন্য একটি অংশকে সামনে নিয়ে আসেন এবং তর্কে লিপ্ত হন। এ ধরনের মাল্টিপল আইডেন্টিটির সাথে যদি ভাষার চমৎকারিত্বের সংযোগ ঘটে, তখন তাকে বুঝতে পারা ও মোকাবিলা করা কঠিন ব্যাপার। ফরহাদ মজহারের সাথে এনগেজ হওয়ার মানে হলো— খেলা চলাকালীন যে মাঠের গোলপোস্ট পরিবর্তন হয়ে যায় সে রকম কোনো মাঠে খেলার মতো বিড়ম্বনা, বোকামী ও পণ্ডশ্রম।

নেতিবাচক সমালোচনা-সর্বস্বতা

ফরহাদ মজহার সবসময়ে একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থান হতে কথা বলেন। এটি কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিকদের একট কমন বৈশিষ্ট্য। সমালোচনা ও খুঁত ধরাতে উনারা যতটা এক্সপার্ট, করণীয় সম্পর্কে বলা ও উক্ত করণীয়ের ভেলিডিটির পক্ষে যুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে উনারা ততটাই পিছলা, পলায়নপর ও অনিচ্ছুক। ইসলাম এ ধরনের তথাকথিত বিচক্ষণতা ও চাতুর্যকে নিরুৎসাহিত করে। দ্বীন ইসলাম হচ্ছে সরল ও স্পষ্ট প্রস্তাবনা (claim)। তাই কোনো কিছুকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল হওয়া, দ্বিমত পোষণ করা ইত্যাদি পদ্ধতি ও সতর্কতা হিসাবে জরুরি হলেও শেষ পর্যন্ত ক্রিটিক্যাল ও সন্দেহবাদী থেকে যাওয়াটা ইসলামের দিকে থেকে খুবই খারাপ। অসুস্থতার লক্ষণ। এই অসুস্থতার আরেকটি লক্ষণ হলো কোনো গবেষক-পণ্ডিতের দুয়েকটি বই পড়েই গ্রস বা কনক্লুডিং মন্তব্য করা। এই আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি উনার সোহবতপ্রাপ্ত সবার মধ্যেই কম-বেশি লক্ষ করি।

এই পণ্ডিতপ্রবর এতো এতো ডিগ্রি নিয়েছেন, এতো ওয়াইড রেঞ্জে পড়াশোনা করেছেন, নিজেকে (রেডিও তেহরানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে) ইসলামিস্ট হিসাবেও দাবি করেছেন; অথচ ইসলামের বেসিক টেক্সট তথা কোরআন ও হাদীস স্টাডি করেছেন, এমনটা মনে হয় না। প্রাক্তন শিবির নেতা, বর্তমানে উনার খুব ঘনিষ্ট লোকজনের কাছ হতে উনার এই গ্যাপ সম্পর্কে কনফার্ম হয়েছি। ইসলাম নিয়ে উনার হাস্যকর ও স্ববিরোধী কথাবার্তা শুনলেও এটি বুঝা যায়।

কেমন করে উনারা পারেন

দু'জন বয়োবৃদ্ধের প্রতি জীবনে আমি হিংসাবোধ করেছি। একজন হলেন চবি'র একজন প্রাক্তন বরিষ্ঠ প্রফেসর। অন্যজন হলেন বাংলাদেশের হ্যামিলনের

বাঁশিওয়ালা ফরহাদ মজহার।

সুদর্শন বলতে যা বোঝায় স্যার তেমনটা ছিলেন না। বয়স তখন ষাটের কোটায়। ক্যাম্পাস ক্লাবে উনার প্রগতিশীল সহকর্মীদের কিশোরী মেয়েদের একটা গ্রুপকে প্রতিদিন সকালের দিকে তিনি টেবিল টেনিস খেলা শিখাতেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য জয়েন করেছি। একদিন ফজরের পরে দক্ষিণ ক্যাম্পাসে লিজেন্ডারি জামায়াত নেতা ড. মোহাম্মদ লোকমান স্যার ও প্রফেসর হারুনুর রশীদ স্যারদের সাথে হাঁটতে বের হয়েছি। কথায় কথায় উনারা স্যারের এসব দৃষ্টিকটু কাজের খুব সমালোচনা করলেন। তখন আমি মকারি করে বললাম, ‘স্যার, আমার তো উনাকে হিংসা হচ্ছে। কই, আমি তো উঠতি বয়সীদের কাউকে আকৃষ্ট করতে পারছি না। যদিও আমি সুদর্শন ও তরুণ...!’ যাহোক, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশীদের কাছ হতে শুনেছি, উনার এক প্রফেসর বন্ধুর বাসায় রাতে ডিনার করে বন্ধুর প্রফেসর স্ত্রীকে নিয়ে উনি উপরের তলায় রাত্রিযাপন করতেন। সকালে সবাই মিলে একসাথে নাস্তা করতেন...!! কী অবাক হচ্ছেন? জগতের অনেক কিছুই আপনারা জানেন না। কার ডিমে কে তা দেয়!

ফরহাদ মজহারকে হিংসা করার কারণ হলো উনার কোনো দল নাই। অথচ, জায়গায় জায়গায় উনার লোক। যারা উনার কাছ হতে ছুটে গিয়ে এখন উনার বিরোধিতা করছে তারাও এমনকি মজহারীয় স্টাইলেই কথাবার্তা বলে ও লেখালেখি করে। অবাক কাণ্ড! তাই না? তিনি এক কথার যাদুকর। তিনি বা তার মেসেজ গ্রহণযোগ্য বা অনুকরণীয় কিনা তা যার যার স্বতন্ত্র বিবেচনার ব্যাপার। তিনি আধুনিক বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একটি স্বতন্ত্র ধারা। অবশ্য অনেকের মতে এটি আদতে আহমদ ছফার ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রজেক্ট। তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে, নিজের সহজিয়া-সাম্যবাদী অবস্থানকে প্রকাশ্যে রেখেই তিনি ইসলামপন্থীদের সবচাইতে চৌকষ লোকজনের একটা বিরাট গ্রুপকে তাদের অজান্তেই নিজ প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসতে পেরেছেন।

উনার বুদ্ধিবৃত্তির ধরনকে আত্মস্থ করে তারা জাতে উঠার চেষ্টায় নিয়োজিত। বারে বারে সব লেখায়, কথায় ও কাজে তিনি নিজেকে লালনপন্থী কম্যুনিস্ট দাবি করলেও ইসলামিস্টদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, বলতে পারেন ক্রিম পোরশান, উনাকে মাথায় তুলে নাচছেন। উনার কাছ হতে আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার তরিকার সবক নিচ্ছেন। উনার স্টাইলে এনজিও করে সামাজিক বিপ্লব করার ট্রেনিং নিচ্ছেন। কম্যুনিজমের সাথে ইসলামের

নির্বিরোধের ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাঠ গ্রহণ করছেন। সেলুকাস! সেলুকাস! বাহ, বাহ, বেশ। ভালো তো, ভালো না? এমন লোককে হিংসা করা বোধকরি 'জায়েয'!

কাকের বাসায় কোকিলের ডিম

মজহারের ফর্মুলা হচ্ছে পার্টি করার দায়দায়িত্ব না নিয়ে কোনো কোনো পার্টির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মগজ ধোলাই করে মাঠে ময়দানের কাজ তথা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। উনার দৃষ্টিতে এটি গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়া। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার মতো। কোকিল যেমন করে কাকের বাসায় ডিম পেড়ে আসে। নিজের মনে করে কাক তাতে তা দেয়। বাচ্চা ফুটলে কাক সেটিকে খাওয়ায়। বড় হওয়ার পর সেই সব কোকিল ছানা মা কোকিলের কাছেই ফিরে যায়। এই কৌশল ও নীতির বাস্তবায়ন তিনি করে চলেছেন। খুব সম্ভবত ইসলামিস্টরাও উনাকে নিয়ে এমনই কৌশলকে মাথায় রাখছেন। উভয় পক্ষই আমার দৃষ্টিতে ভুল করছেন।

নিজেদের বিপ্লব অন্যরা করে দেয় না

সমমনা কারো সাথে বা কৌশলগত সম্পর্কে সম্পর্কিত কারো সাথে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত যাওয়া যায়। কিন্তু কারো বোঝা অন্য কেউ বহন করে না। আমার বিপ্লব অন্য কেউ করে দিবে না। ইরানের কম্যুনিস্ট তুদেহ পার্টি ইরান বিপ্লবের সময়ে মোল্লাদের সাথে আঁতাত করেছিলো। এমনকি একসাথে মাঠে-ময়দানেও ছিলো। তাদের ধারণা ছিলো মোল্লারা আর কী করতে পারবে? এরপর তো ময়দান আমাদের জন্য ফাঁকা। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, তারা ভুল করেছিলো। বাংলাদেশে ৭৫ পরবর্তী সময়ে কর্নেল তাহেরের 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' জিয়াউর রহমানকে নিয়ে এ রকম খেলা খেলছিলো। পরবর্তী ইতিহাস আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে, নিজেদের বিপ্লব একান্ত নিজের লোক দিয়েই করতে হয়। পুতুল শাসকও মুহূর্তের মধ্যে সত্যি সত্যি চেপে বসতে পারে। হিংস্র পোষা প্রাণী যে কোনো মুহূর্তে ঘাড় মটকাতে পারে। দুঃখজনকভাবে এটি মানুষ কখনো কখনো ভুলে যায়।

প্রকৃতিগত অনুপপত্তি (fallacy)

'কাকের বাসায় কোকিলের ডিম' ব্যাপারটিকে ইনফর্মাল লজিকে প্রকৃতিগত অনুপপত্তি (naturalistic fallacy) হিসাবে মনে করা হয়। ন্যাচারালিস্টিক

ফ্যালাসি হলো প্রকৃতির বিরল ও বিরুদ্ধ ঘটনাকে কোনো আচরণের বৈধতার পক্ষে দাবি হিসাবে উপস্থাপন করা বা এর বৈধতার ভিত্তি হিসাবে দাবি করা। তাই প্রকৃতিতে থাকলেই হবে না, সংশ্লিষ্ট আচরণটি কমন নাকি এক্সেপশনাল, তাও দেখতে হবে। তা না হলে প্রকৃতিকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করার পুরো প্রস্তাবনাটাই কলাপস করবে।

এতক্ষণে পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট, কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদীদের সাথে নাই।

ফেইসবুকে পাঠকদের মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Ohidul Islam: ফরহাদ মজহার সম্পর্কে আলোচনাটা যথার্থ হয়েছে। ফরহাদ মজহার দৃশ্যত সরকারবিরোধী কিছু কথা বলে অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তখন তার আকীদা/বিশ্বাস কেউ যাচাই করেনি। তবে এখন সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাকে দাওয়াতী টার্গেটে রেখে হক পথে আনতে পারলে ভিন্ন কথা।

Abdullah Russel: স্যার, এক্সিলেন্ট সব কথা বলেছেন। ফরহাদ মজহারীয় দর্শন নিয়ে আপনার সম্ভবত আরো অনেক কিছু বলার আছে। কারণ আমরা যে যাই বলি না কেন, উনি কিন্তু নতুন একটা দর্শনের পাঠ সবাইকে দিচ্ছেন। উনার চিন্তাভাবনাগুলোর মতো করে আর কাউকে কখনো দেখিনি। তাই উনার কাছ থেকে এই জেনারেশন কতটুকু গ্রহণ করতে পারে, আর কতটুকু বর্জন তা নিয়ে আপনাকে লেখার অনুরোধ রইলো।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** মজহারীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে আমার ক্লোজ অবজার্ভেশন আছে। এ কথা সত্য। উনার প্রতিটি লেখা আমি পড়ি এবং সংরক্ষণ করি। নানা কারণে আমি ওসবে এনগেইজ হতে চাই না। এর একটা হলো, রিফিউটেশনের চেয়েও কনস্ট্রাকশনকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাই না?
>
> **Abdullah Russel:** মজহার সাহেবের বিষয়ে আপনি এই নোটে অনেক কিছুই বলেছেন। এতদিন উনার দর্শনচিন্তা নিয়ে ওভাবে ভাবি নাই। তাই টনক নড়ে নাই। অনেকেই পাঠচক্রে যেত, যায়। অতো মাথা ঘামানোর

কিছু মনে করতাম না। কিন্তু আজকে নতুন করে চিন্তার খোরাক পেলাম আপনার নোটে। তাই বলছিলাম, নাম উল্লেখ না করেও ভবিষ্যতে একটি শুদ্ধ ইসলামী বিপ্লবের পথে যা যা আগাছা, সেইসব বিষয়ে আপনি প্রয়োজন মনে করলে লিখে যেতে পারেন। তাতে আমাদের লাভ হতো। আর স্যার, ইয়াংরা ফ্যান্টাসিতে থাকে। আমিও ইয়াং, আমিও থাকি। অনেকের সুন্দর বাচনভঙ্গির মোহে আমরা পড়ে যাই। তাই তার সব কথাকে আমরা গিলি। এই ব্যাপারগুলো আপনার লেখায় আরো বেশি করে আসবে, সেই আশায় থাকলাম।

মোশারফ হোসেন মাসুদ: ফরহাদ মজহারের ইসলামিক থিওলজি সোনার পাথর বাটি ছাড়া আর কী? এ লেখা পড়ার আগে ইসলামপন্থিদের সাথে তার সম্পর্কের গভীরতার বিষয়টি অজানা ছিল। নিজে কখনো তার লেখা পাড়ার খুব গুরুত্ব অনুভব করিনি। পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তজাতিক প্রেক্ষিতে এ দেশে একটি স্কুল অব ইসলামিক থট গড়ে তোলা দরকার। আপনার চেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

Ibrahim Hossain: বরাবরের মতই গুছানো লিখা। আমি অবাক হই দীর্ঘ তিন দশক জামায়াতের ফ্রন্ট লাইনার অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিস্ট থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই লেভেলের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা সম্ভব!

ফরহাদ মজহারকেন্দ্রিক আলোচনা ঠিকই আছে। তবে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেখানে শহীদ কামারুজ্জামান ও ব্যারিস্টার রাজ্জাকের মতো লোকের পরামর্শ ও প্রস্তাবনাকে আমলে নেয় না, তারা মজহারের প্রেসক্রিপশনে সহজে বিভ্রান্ত হবে বলে মনে হয় না।

জনৈক সুদর্শন প্রফেসরের প্রসঙ্গটা ঠিকই ছিল, তবে বেডরুম পর্যন্ত প্রবেশ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: বিভ্রান্ত হচ্ছে সংস্কারবাদীরা মূলত। আর হ্যা, বেডরুমের প্রসঙ্গ না আনলেও পারতাম। মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

Abdullah AL Takdir: “মজহার যে পর্যালোচনার মধ্যে ধর্ম ও ইসলামকে বুঝাতে চান তা সেকুলার। মজহার-সলিমুল্লাহ নগদ রাজনীতির মাঠে ইসলামের একটা সেকুলার ভার্সন হাজির করতে চায়। মজহারের ইসলাম বুঝার দার্শনিক ভিত্তি হইলো লালনপন্থা। এরা কেউ ইসলাম ও সেকুলারিটিকে এপিস্টিক দিক থেকে পর্যালোচনা করে দেখেননি।”

মজহার সম্পর্কে এই লেখাগুলো দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনে রেজাউল করিম রনি ভাইয়ের "বাঙালি সেকুলারের মন" প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

চিন্তা-দর্শন-বুদ্ধি পরস্পর পরস্পরের কাছে এখন প্রায়ই ক্লিয়ার, বিদ্বেষমুক্ত হয়ে সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মুক্তিই আমাদের মতো সাধারণ জনতার একমাত্র প্রত্যাশা। আমরাই আমাদের পক্ষ-প্রতিপক্ষ জয় পরাজয় ঠিক করে নিবো।

Anwar Mohammad: ফরহাদ মজহারকে বেহুদাই নাড়ানাড়ি করলেন। একদম অনর্থক। কিছু মানুষ বনসাই গাছের মতো বয়সে বাড়ে কিন্তু মানসিকভাবে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। জামায়াত-শিবিরের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকাংশ কর্মির তুলনা চলে বনসাই গাছের সাথে। কিন্তু কিছু মানুষ আগায়, সামনে বাড়ে, বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যায়... আজীবন... মৃত্যু পর্যন্ত। আপনার ঘোসসা জামায়াতের উপর, সেটা করুন। কিন্তু সেখানে ফরহাদ সাহেবেকে জড়িয়ে কু-যুক্তি দেয়া দরকার ছিল না। ফরহাদ মহজার একটা "নিজস্ব ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে" এই লাইনেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায়। আপনিই যেটা বলেছেন তিনি সব সময়ই লাউডলি এন্ড ক্লিয়ারলি বলেছেন তিনি মার্কসিস্ট। সেটা তো তিনি গোপন রাখেননি। ইসলামপন্থীরা যদি রাজনীতির ডিগবাজিতে তার কাছে যায় তাহলে তার সমস্যা কী? তার উপর, এটা তো ফরহাদ মজহারের ক্রেডিট যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার হয়েও ইসলামপন্থিদের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন। আপনি কি এরকম একটা উল্টো জার্নি করতে পারতেন? Can you reach out to your ideological opponent for greater interest? দর্শন তো অনেকেই পড়ে, আপনি তো পড়ানও। কিন্তু সবাই কি দার্শনিক হয়? ফরহাদ মজহারকে ডিফেন্ড করার কোনো খায়েশ আমার নাই, কিন্তু কেউ নিজের অক্ষমতার জন্য অন্যকে অফেন্ড করলে তাকে শোধরানোর চেষ্টা করা নৈতিক দায়।

আপনার লেখা ভাল, এভাব এবারেজ, কিছু চিন্তাশীল কথাও আছে। কিন্তু যেই প্রিজম দিয়ে সমাজ দেখেন সেইটা তো সামগ্রিক না ভাই। জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় অর্থনীতি, কালচার, সাহিত্য, ইতিহাস, কনফ্লিক্টিং আদর্শের কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ এবং সমাধান পেশ করতে না পারলে শুধু ধর্মতত্ত্বের সিংগেল প্রিজম দিয়ে সমসাময়িক মানব, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান হয় না। ফরহাদ মজহারের অন্তত এমন একটা কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ আছে। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, কৃষিবিদ, ভাববাদী এবং এক্টিভিস্ট। এরপরও তিনি এখন

ইসলামপন্থীদের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করেছেন, বুঝার চেষ্টা করেছেন এবং আমরা দেখেছি এর ফলে তার চিন্তায় ইসলামপন্থীদের ওসওয়াসাও পড়েছে। হয়তো তার জীবনে এই অংশের বুঝটাই মিসিং ছিল। কিন্তু আপনার কি এই চেষ্টা বা সুযোগ হয়েছে?

তার সব কিছুর সাথে, সব বক্তব্যের সাথে একমত হওয়ার দরকার নাই। তার দর্শনের, মতামতের যৌক্তিক সমালোচনা আপনি করতেই পারেন। সলিমুল্লাহ খান যেমন কিছুটা 'চেষ্টা' করে মাঝে মাঝে। সেটা না করে আপনি কিছু জামায়াতী ওনা-পানা করলেন যেটা খুব ভালো ঠেকেনি। কিশোরসুলভ হয়ে গেলো মনে হয়েছে।

যাই হোক, আপনার যদি ফরহাদ সাহেবের কোনো মতামতের বা দর্শনের সুনির্দিষ্ট সমালোচনা, পর্যালোচনা থাকে তাহলে জানালে উপকৃত হতাম। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: "চিন্তার প্যারাডাইম, প্যারাডাইমের পরিবর্তন ও চিন্তাগত উন্নয়ন প্রসঙ্গে কিছু প্রতিমন্তব্য" শীর্ষক আমার জবাবটা পড়েন।

Anwar Mohammad: দর্শন নিয়ে লেখাগুলো পড়বো সময় করে। সংক্ষেপে যেটা বলার, আপনি জামায়াত করেন না বললেও, জামায়াতের সংস্কারবাদী নন ঘোষণা দিলেও দিনশেষে আপনি জামায়াত নিয়ে ব্যাপক টেনশনে আছেন। জামায়াতের লোকদের মজহারী দর্শনে 'দর্শিত' হওয়া থেকে তাঁদেরকে উদ্ধার করতে কলম চালাইছেন, আদতে এটা জামায়াতেরই খেদমত। কারণ, দিনশেষে জামায়াতীরা বলবে: ওহ! জামায়াতের বয়ানই ঠিক বা মন্দের ভালা। সংস্কারপন্থী নন বলে আবার যখন সংস্কারপন্থিদের ক্রিটিক করেন, তখন এটা বলা লাগে না যে আপনি আদতে সংস্কার চান, তবে সেটা আপনার মতো করে। আর সেটা হবে না বা হয়নি দেখে আপনি হতাশ। এটা ঠিক আছে। তাহলে দিনশেষে ফলাফল কী? "দিস ইজ দ্যা ফেলাসি অফ মওদুদী স্কুল অফ থট— আমি নাই আবার আমি আছি।" আমি আজ পর্যন্ত মওদুদিয়াতী কাউকে পেলাম না হো কুড গো বিয়ন্ড হিম। হোয়াট এ ফেলাসি! এ মেন হো অলওয়েজ ক্রিটিসাইজড আদার্স টু ক্রিয়েট হিজ ঔন দিসকোর্স, সেখানে তার তথাকথিত অনুসারীরা তাকে ক্রিটিক করতে পারে না বা চিন্তাও করে না।

মজহার বিষয়ক আলাপ শেষ করি। মজহারকে কেন তার সাবেক-বর্তমান

বামাতী সতীর্থরা ‘জামায়াতি’ বলে এর উত্তর অন্তত আপনার খোঁজা দরকার ছিল। হোয়াই হি ডাজ নট বিলং টু এনি ওয়ান বা এনিগ্রুপ বাট হিম? এর উত্তরে ‘জামায়াত ট্যাবু’ ব্যাখ্যা অন্তত এইক্ষেত্রে স্থূল। তবে সোসাল আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে ইনফরমালি এটা চলে, যেমন চলে ‘শাহবাগী’ বলে কাউকে চিত্রায়িত করা। তো, মজহারকে যদি একটি ধারা স্বীকার করেন, তাহলে তার বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশনকে গ্রহণ করতে সমস্যা কোথায়? সে জামায়াতীদেরকে দিয়ে সহজিয়া-সাম্যবাদ কায়েম করতে চায় এমন ‘দিলের’ কথাটা যেমন তার উপর চাপানো, ঐতিহাসিকভাবে অচল তত্ত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইগনোর করা দরকারী বিষয়। দুনিয়াতে এমন ঘটনা কি কেউ পেরেছে? আবুল হাশিম সাহেব কি পেরেছেন তার ‘হুকুমতে রাব্বানী’ অন্যদের দিয়ে কায়েম করতে?

পরের আলাপ, আপনি যখন ইসলামের সামগ্রিকতার কথা বলেন তখন কি মওদুদী সাহেবের ডিসকোর্সের ‘দ্বীন কমপ্লিট কোড’ মিন করেন? আপনার সাথে ইসলাম নিয়ে আলাপের বোঝাপড়া তো এখান থেকে শুরু করতে হবে। আপনি যখন তাওহীদকে অন্টলজির বেসিস ধরেন তার সাথে তো মুসলিম মাত্রেই একমত হওয়ার কথা। কিন্তু যেই ইপিস্টিমলজি আপনি বয়ান করতে চান বা যাকে আপনি বেইস ধরতে চান তার সাথে তো ঈমানদার হয়েও দ্বিমত, তৃমত করা সম্ভব, তাই না? সো, আমজনতার মতো করে ‘ইসলামই আমার শেষ খুঁটি’ এমন ঢালাও মন্তব্য করা বেহক, অন্তত যে বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ আপনি আগাইতে চান তার বিষয়ে। কারণ, যেটা দিয়ে আপনি শেষ করতে চান, সেটা দিয়েই হয়ত আমি শুরু করতে চাই।

আপনি যখন ‘ইসলাম’ আলাপ করতে চান, তখন মনে রাখা দরকার ইসলামের বয়স অন্তত ১৪০০ বছর, এমন কোনো বিষয় নাই ইসলামের, যেটা নিয়া শত শত মুমিন-অমুমিন মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন বয়ান দেন নাই। তাহলে মৌলিক প্রশ্ন আসতে পারে ‘বিশ্বাস’ কী? বিশ্বাসের দর্শন কী? বিশ্বাস ইজ নাথিং বাট বিশ্বাস, বিশ্বাসের ফিলসফি ইজ নাথিং বাট বিশ্বাস। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যে কোনো জ্ঞানতত্ত্বের বই বা প্রবন্ধ খুলে বিশ্বাস শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে জানার অনুরোধ করছি। আর আমার জবাবমূলক লেখায় আরো যেসব লেখার উল্লেখ করেছি, সেগুলোও পড়ার অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।

চিন্তার প্যারাডাইম, প্যারাডাইমের পরিবর্তন ও চিন্তাগত উন্নয়ন প্রসঙ্গে কিছু প্রতিমন্তব্য

প্যারাডাইম কথাটা বিজ্ঞানের দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানে বেশি ব্যবহৃত হয়। মানুষ যে আবহে চিন্তা করে অর্থাৎ চিন্তার যে সামগ্রিক ধরন বা কাঠামোর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তি কাজকারবার করে সেই আবহ, মেজাজ, ধরন বা কাঠামোকে প্যারাডাইম অব থট বলা যায়। একে চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তির আকার বা ভিত্তিমূল হিসাবে বলা যায়। অন্য কথায়, একে বিশ্বদৃষ্টি বা জীবনদৃষ্টিও বলা যায়। প্রতিটা মানুষেরই এক একটি প্যারাডাইম আছে। থাকতে বাধ্য।

মানুষের চিন্তায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। বিবর্তন ঘটে। চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তির এই স্বতঃপরিবর্তন ও বিবর্তনের একটা পরিণত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনদৃষ্টি বা বিশ্বদৃষ্টি গড়ে উঠে। চিন্তাগত উন্নয়ন বা অধোগতি মানেই কিন্তু প্যারাডাইম শিফট নয়। মানুষের জীবনে প্যারাডাইম শিফট তাই কদাচিৎ ঘটে। প্যারাডাইম সম্পর্কে এটুকু বলার পর এই বিষয়ে নোট লেখার প্রসঙ্গকে খোলাসা করা যাক।

প্যারাডাইম অব থট এবং ডেভেলপমেন্ট অব থটের পার্থক্য

কয়দিন আগে ‘কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ শিরোনামে চার পর্বের একটা নোট ফেইসবুকে প্রকাশ করি। সেখানে আমি সংস্কারবাদীদের ছয়টা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করি যেগুলোর প্রত্যেকটিকে আমি ভুল মনে করি। তার মধ্যে তৃতীয় পয়েন্টটা ছিলো ‘মজহারপন্থা’। উক্ত নোটে গতকাল একজন বিজ্ঞ পাঠক কিছু মন্তব্য করেছেন। আমার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও বৃহত্তর পরিসরে ভুল বুঝাবুঝি এড়ানোর জন্য কথাগুলোকে উদ্ধৃত করে আমি কিছু কথা বলতে চাই।

পাঠক বলেছেন, *“কিছু মানুষ বনসাই গাছের মতো বয়সে বাড়ে কিন্তু*

মানসিকভাবে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। জামায়াত-শিবিরের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকাংশ কর্মির তুলনা চলে বনসাই গাছের সাথে। কিন্তু কিছু মানুষ আগায়, সামনে বাড়ে, বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যায়... আজীবন... মৃত্যু পর্যন্ত। ... ফরহাদ মহজার একটা "নিজস্ব ট্রান্সফরমেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে" এই লাইনেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায়।"

ফ্যালাসি অব একজাম্পল বা উদাহরণের অনুপপত্তি নামে একটা ফ্যালাসি হতে পারে। এটি হলো সমধর্মী উদাহরণ দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাব্যতা। যেমন এখানে বনসাই গাছের কথা বলা হয়েছে। যে গাছ বাড়ে না তাকে বনসাই বলে। 'বাড়ে' বলতে কতটুকু বাড়ার কথা বুঝানো হয়? নিশ্চয়ই ওই গাছটা নরমালি যতটুকু বাড়ার কথা ততটুকুকে বুঝানো হয়। 'বাড়ে' শব্দটাকে তাই আক্ষরিকভাবে বুঝার সুযোগ নাই। না হলে তো এক একটা গাছ আকাশকেও ছাড়িয়ে যেতো। ক্রমাগত বাড়তেই থাকতো ...!

গাছের বৃদ্ধির সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশনের তুলনা করা যায়। বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশন যদি নির্দিষ্ট একটা প্যারাডাইম অব থটকে বেছে নেয়া এবং সেটির মধ্যে থেকে ক্রমাগত নিজেকে এডাপ্ট অর্থাৎ ডেভেলপ করা বুঝায় তাহলে তা সমর্থনযোগ্য। সঠিক। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রান্সফরমেশন মানে যদি হয় "আজীবন... মৃত্যু পর্যন্ত" তাহলে তো এটি ভারি বিপদের কথা। কোনো সুস্থচিন্তার মানুষই জীবনভর বারে বারে প্যারাডাইম চেঞ্জ করে না। এটি অবাস্তব। মানুষ আজীবন নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করবে, যথাসম্ভব পরিশুদ্ধ ও বাস্তবানুগ করার চেষ্টা করবে। এটি স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে ক্ষণে ক্ষণে নিজের চিন্তার ছক বা ধরন, যাকে আমি প্যারাডাইম বলছি, তা বদল করবে বা করে— এমন নয়। এহেন দাবি অবাস্তব। প্যারাডাইম অব থট এবং ডেভেলপমেন্ট অব থটের পার্থক্য না বুঝার কারণে কারো মধ্যে কোনো বিষয়ে এ ধরনের বিভ্রান্তি হতে পারে।

ফরহাদ মজহারের প্যারাডাইম অব থট কী?

আমার নোটের সম্মানিত পাঠকই তার মন্তব্যে ফরহাদ মজহারের প্যারাডাইম অব থট — সংক্ষেপে প্যারাডাইম — সম্পর্কে বলেছেন, *"তিনি সব সময়ই লাউডলি এন্ড ক্লিয়ারলি বলেছেন তিনি মার্কসিস্ট, সেটা তো তিনি গোপন রাখেননি।"* আমিও তো তাই বলি। যা আমার সংশ্লিষ্ট নোটে উল্লেখ করেছি। অতএব, ফরহাদ মজহারের চিন্তাধারা ক্লিয়ার নয়— এমন উদ্ভট দাবি আমি

কেন, কেউই করার কথা নয়। ফরহাদ মজহার যে মার্ক্সবাদের প্রিজম দিয়ে সবকিছুকে দেখেন অথবা নিজের মনের প্রিজম দিয়ে মার্ক্সবাদ ও সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে রঙিন করে চিত্রিত করেন, দেখে থাকেন তা স্পষ্ট।

আমার আপত্তি ফরহাদ মজহারের কোনো কিছু নিয়ে নয়। বরং জামায়াতের সংগঠনবাদী ও সংস্কারবাদী উভয় ধারার লোকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 'মজহার-তত্ত্ব' না বুঝা সত্ত্বেও উনাকে 'নিজেদের' লোক হিসাবে 'আপন' মনে করাই আমার আপত্তির জায়গা। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তাদের এই অবুঝ মনোভাব আমার কাছে তাদের অবস্থানের দিক হতে স্ববিরোধী বলে মনে হয়েছে। আমি প্রমাণ দেখিয়েছি, ভেটেরান জামায়াত কিন্তু মজহারের সাথে যোগাযোগ রাখেন এমন লোকেরা নিছক কৌশলগত রাজনৈতিক সম্পর্কের বাইরে গিয়ে তার ভাবাদর্শকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রমোট করেন। এমনকি কিছু কিছু সাপোর্টও করেন। জামায়াত করা লোকদের যারা উনাকে 'ফরহাদ ভাই' সম্বোধন করেন, তাদের অনেকেরই বুদ্ধিবৃত্তিক দীনতা ও হীনমন্যতাবোধ প্রকট। এমন নয় যে উনারা কম মেধাবী। আসলে বুদ্ধিবৃত্তি তো স্বাধীন ও নিয়মিত চর্চার বিষয়। তাই না?

আর কেউ যদি বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রুপ ও দলের প্যারাডাইমগত ভিন্নতার বিষয়টাকে অস্বীকার করেন কিংবা ইসলাম ও মার্ক্সিজমের প্যারাডাইমগত মৌলিক পার্থক্যের বিষয়টিকে অস্বীকার করেন, তাহলে আমার আর কিছু বলার নাই। কেননা, কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, তোমরা যখন জাহেলদের মুখোমুখি হবে তখন 'সালাম' বলে এড়িয়ে যাবে।

কাউন্টার প্যারাডাইমের সাথে ইন্টারেকশান

"আপনি কি এরকম একটা উল্টো জার্নি করতে পারতেন? Can you reach out to your ideological opponent for greater interest?"— উক্ত সম্মানিত পাঠক এই মন্তব্যটা কী বুঝে করেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। মনে হয় তিনি বিকল্প প্যারাডাইমের অনুসারীদের সাথে ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টারেকশানকে দিনে-রাতে প্যারাডাইম পরিবর্তনের অবাস্তবতার সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। অথবা, আমার প্যারাডাইম সম্পর্কে উনার অস্পষ্টতা রয়েছে। বিষয়টা অতীব বিস্ময়কর! কারণ, আমার মেটা-রিয়েলিটি বলুন, এবসলিউট আইডিওলজি বলুন, অন্টলজি বলুন বা এপিস্টেমোলজি বলুন— তা হলো ইসলাম। যদি তাই হয়, তাহলে আমার 'উল্টো জার্নি' থাকবে কেন, তা বুঝতে

পারছি না। সংশ্লিষ্ট সম্মানিত পাঠকের মতে, *“ফরহাদ মজহারের অন্তত এমন একটা কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ আছে। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, কৃষিবিদ, ভাববাদী এবং এক্টিভিস্ট।”* ফরহাদ মজহারের ‘কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ’ থাকায় অসুবিধা না থাকলে আমার বা যে কারো তার নিজের মতো করে ‘কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ’ থাকলে বা তা কেউ নিজের মতো করে তৈরি ও ব্যাখ্যা করলে সমস্যা কী?

হ্যাঁ, আমার ‘কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ’ হচ্ছে ইসলাম। যেমন করে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, “... যে আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসাবে এবং মুহাম্মদকে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে”, আমি তেমনই একজন। ফরহাদ মজহারের সহজিয়া-সাম্যবাদী ‘কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ’কে যে কেউ সমর্থন করতে পারে। আমি একে ‘ইসলাম বহির্ভূত অপরাপর দ্বীন বা জীবনাদর্শে’র মধ্যে গণ্য করি। অতএব বিরোধিতা করি। ইসলাম থেকে ভিন্ন যে কোনো কিছুকে স্পষ্টতই বিরোধিতা করা আমার ইসলামচেতনার দাবি। প্রায়োগিক সকল বিষয়ে কম-বেশি সহনীয় মনোভাবের (inclusive) হলেও আকীদাগত (philosophical) দিক থেকে ইসলাম হ্যাঁ/না ধরনের বাইনারিতে বিশ্বাসী।

ফরহাদ মজহারের সহজিয়া-সাম্যবাদ কোনো সাময়িক রাজনৈতিক কৌশলের বিষয় নয়। ইসলামের দিক থেকে এটি অন্যতম বাতিল জীবনদৃষ্টি বা মতবাদ। ইসলামপন্থী সরলমনা লোকজনেরা এই দিকটা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়। একজন ইসলামপন্থী হিসাবে এটি স্বভাবতই আমার কাছে উৎকণ্ঠার বিষয়। ইসলামপন্থার সাথে এ দেশে বামপন্থার অসম যুদ্ধকে তিনি বামপন্থার পক্ষে পুনর্বিন্যাস করতে চান। আমি এর প্রতিবাদ করি। ইসলামপন্থীদেরকে সতর্ক করাই আমার উদ্দেশ্য।

আমার মজহারবিরোধিতাকে একজন ‘মজহার ফোবিয়া’ বলেছেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের উক্ত প্রাক্তন কেন্দ্রিয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য যেভাবে ফরহাদ মজহারের পেছনে হাঁটাহাঁটি করেন তাকে কেউ ‘মজহার ম্যানিয়া’ও বলতে পারে। মজহার আমার কনসার্ন নন, আমার কনসার্ন হলো ইসলামপন্থীদের মধ্যকার অবুঝদের আত্মপ্রতারণা ও অন্তর্বিরোধকে দৃশ্যমান করা। যার মন্তব্যের সূত্রে এই দীর্ঘ প্রতিমন্তব্য সেই পাঠকের সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের এই অংশের সাথে আমি শতভাগ একমত: *“ইসলামপন্থীরা যদি রাজনীতির ডিগবাজিতে তার কাছে*

যায় তাহলে তার সমস্যা কী? তার উপর, এটা তো ফরহাদ মজহারের ক্রেডিট যে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার হয়েও ইসলামপন্থিদের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন।”

ফরহাদ মজহার তার চিন্তা ও কাজে মোর কনসিসটেন্ট। ফরহাদ মজহারের কোনো ‘উল্টো জার্নি’ নাই। কেউ কেউ মনে করছেন, যেমন আলোচ্য পাঠক মন্তব্যের এক পর্যায়ে বলছেন, *“তিনি এখন ইসলামপন্থীদের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করেছেন, বুঝার চেষ্টা করেছেন এবং আমরা দেখেছি এর ফলে তার চিন্তায় ইসলামপন্থীদের ওসওয়াসাও পড়েছে। হয়তো তার জীবনে এই অংশের বুঝটাই মিসিং ছিল।”* মজহারকে যারা সঠিকভাবে পাঠ করতে পারেন নাই, যারা চিন্তাধারা বা প্যারাডাইমকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, আমার দৃষ্টিতে, কেবলমাত্র তারাই এমন গ্রস মন্তব্য করতে পারে। তিনি ‘তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে ...’ শিরোনামের আর্টিকেল লেখার পরও, বারে বারে নিজেকে মার্ক্সিস্ট দাবি করার পরও, জামায়াত-শিবিরের অনেকেই কেন তার মধ্যে (ইসলামের দিক হতে ইতিবাচক) ‘পরিবর্তন’ দেখে, তা আমার বুঝে আসে না।

এ দেশীয় বামপন্থায় রেডিকেল রিফর্মিস্ট এবং এ কারণে নিজ পেরিফেরি হতে ‘সমাজচ্যুত’ ফরহাদ মজহার তার ‘গণতান্ত্রিক রূপান্তরের’ ফর্মুলা অনুসারে ইসলামপন্থীদেরকে ব্যবহার করতে চান। আকীদাগত যে ইসলাম, যাতে শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার টেক্সটচুয়্যাল ব্যাপারটাকে কোনোমতেই, বিন্দুমাত্রও কম্প্রোমাইজ করা যায় না, সম্ভব না— সেই ইসলামে উনার কোনো আগ্রহ নাই। থাকার কারণও নাই। উনার লেখা পড়ে বা কথাবার্তা শুনে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। হ্যাঁ, স্বীকার করি, ফরহাদ মজহারের ‘জার্নি’ আছে। তবে সেটি স্বীয় মতের নির্মাণ নয়। বরং তা হলো বাস্তবায়নের, পদ্ধতি নির্ণয়ের ও সম্পর্ক-বলয় সৃষ্টির জার্নি। ‘সহজিয়া-সাম্যবাদে’র বড়ি কতো সফিসটিকেটেড উপায়ে গিলানো যায়, সেই পদ্ধতি বের করার জার্নি ব্যতিরেকে মজহারের মধ্যে আর কোনো জার্নি তো দেখি না।

ফরহাদ মজহার কি দার্শনিক?

হ্যাঁ, ফরহাদ মজহার একজন দার্শনিক বটে। অন্তত কন্টিনেন্টাল ফিলোসফার দেরিদার সাহাবীতুল্য দার্শনিক তিনি। তার ‘দার্শনিক বিরাটত্ব’ প্রমাণের জন্য তিনি দেরিদার সাথে কথা বলেছেন, তার অনুসারীদের এমন আবেগপ্রবণ কথা গদগদ হয়ে বলতে শুনেছি। যাহোক, আমার সাথে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন

আলোচনায় এসেছেন এমন সবাই এটি জানেন ও মানেন যে আমার দৃষ্টিতে মানুষ মাত্রই এক একজন স্বভাবগত দার্শনিক। Whenever a person takes any decision, he/she makes a choice. Whenever someone claims something, he or she must attach any favourable argument. Whereas, making choice or putting argument is nothing but doing philosophy. এই দৃষ্টিতে দর্শনের কলাপসকে যারা ক্লেইম করেন তারা আদতে দর্শনই চর্চা করেন। সবাই যখন দার্শনিক, নিঃসন্দেহে সুলেখক, কবি, কৃষিবিদ, এনজিওবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লালনভক্ত ফরহাদ মজহারও একজন দার্শনিক। তুলনামূলকভাবে খানিকটা উঁচু মানের দার্শনিক।

তিনি তাঁর পাঠচক্রে দর্শন নিয়ে কাজ করেন। মহাদেশীয় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে তিনি প্রায়শই এনগেজ হোন। তা হলো phenomenology। ফেনোমেনোলজি হলো দার্শনিক উত্তরাধুনিকতাবাদের একটা প্রকরণ। দার্শনিক উত্তরাধুনিকতাবাদের মূলকথা হলো চিরন্তন সত্য বলে কিছু নাই। সব সত্যই নির্মিত সত্য। সব বাস্তবতাই লোকাল। গ্লোবাল রিয়েলিটি বলে কিছু নাই। দার্শনিক উত্তরাধুনিকতার সাথে সাংস্কৃতিক উত্তরাধুনিকতাবাদের পার্থক্যকে স্মরণে রাখতে হবে। যাহোক, ফেনোমেনোলজি কন্টিনেন্টাল ফিলোসফিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যারা ফিলোসফি পড়েন নাই, তারা না জানলেও দর্শনের যে কোনো ছাত্রই জানে, এ রকম গুরুত্বপূর্ণ কনটেম্পরেরি টপিক অন্তত কয়েক ডজন আছে। যারা ফিলোসফির কিছু বুঝে না, তারা এক লাফে কীভাবে ফেনোমেনোলজি বুঝা শুরু করে দ্যায়, তা আমার কাণ্ডজ্ঞানে ধরে না। তিনি কান্ট ও হেগেল নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন। এর কারণ স্পষ্ট। যে কেউ মার্ক্সবাদ পাঠ করতে গেলে কান টানলে মাথা আসার মতো মার্ক্সের সরাসরি শিক্ষক ফ্রেডারিক হেগেলের প্রসঙ্গ আসবেই। কারণ, মার্ক্সের একটা পরিচিতি হচ্ছে তিনি 'হেগেলিয় বাম' ধারার অনুসারী। এটি বলা বাহুল্য, ইমানুয়েল কান্ট হলেন হেগেলের পূর্বসূরী। এক অর্থে, হেগেলের দর্শন হচ্ছে কান্টের পর্যালোচনা। ফরহাদ মজহারের সাথে আমি সমকালীন পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে এনগেজ হতে চেয়েছিলাম। এ লক্ষ্যে উনার বিশ্বাস ব্যবস্থা সংক্রান্ত নোটের প্রথম দিকে আমি কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও করেছিলাম। তিনি এড়িয়ে গেছেন।

যাহোক, *"দর্শন তো অনেকেই পড়ে, আপনি তো পড়ানও, কিন্তু সবাই কি*

দার্শনিক হয়?"— বিজ্ঞ মন্তব্যকারীর এই কথার তাৎপর্য কী হতে পারে তা ভেবে উপরের কথাগুলো বলা। বুঝতে পারছি না, 'সবাই কি দার্শনিক হয়' বলতে উনি আসলে কী বুঝাতে চেয়েছেন। হয়তো বলতে চেয়েছেন, আপনি দর্শন পড়ালেও দার্শনিক হতে পারেন নাই। কথাটা ঘুরিয়ে বললে, ফরহাদ মজহার দর্শনের শিক্ষক না হলেও তিনি দার্শনিক বটে। এটি ঠিক, যাদের তত্ত্ব ও বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে পড়ানো হয়, আমি তেমন কেউ নই। ফরহাদ মজহারও কি তেমন কেউ? অবশ্য যে দেশে আরজ আলী মাতুব্বরের 'লোক-বুদ্ধিবৃত্তি' (folk-intellectuality) নির্ভর পপুলার রাইটআপকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে পড়ানো হয়, সে দেশে এক সময়ে মজহার তত্ত্বও কোনো না কোনো খানে পড়ানো হবে, এমনটা ভাবতে অসুবিধা নাই।

কাকে ডিফেন্ড করা, কাকে অফেন্ড করা, কার কতটুকু দায় কিংবা অক্ষমতা

আলোচ্য মন্তব্যকারী সুহৃদ এক পর্যায়ে বলছেন, *"ফরহাদ মজহারকে ডিফেন্ড করার কোনো খায়েশ আমার নাই, কিন্তু কেউ নিজের অক্ষমতার জন্য অন্যকে অফেন্ড করলে তাকে শোধরানোর চেষ্টা করা নৈতিক দায়।"* আমার মূল নোটের একটা পয়েন্ট ছিলো ফরহাদ মজহার তাঁর লেখা ও কথাবার্তায় এক ধরনের মাল্টিলেয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করেন। প্রতিটা লেখায় তিনি নানা রকমের কথাবার্তার একটা ধোঁয়াশা তৈরি করেন। কয়েকটা দৃশ্যত নির্দোষ কথার ফাঁকে উনার ককটেল মতবাদ সহজিয়া-সাম্যবাদের দাওয়াই সেট করে দেন। এ ধরনের কাজ-কারবার বুদ্ধিবৃত্তিক অসততাও বটে। যারা সবসময়ে 'তর্ক' তুলে বাতচিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তাদের কাছে এ ধরনের নেতিবাচক পদ্ধতি মুখরোচক হতে পারে। আমার বুঝজ্ঞান মোতাবেক, ইসলাম অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদি বিষয়গুলোকে তো বটেই, সব নৈমত্তিক কথাবার্তাকেও যথাসম্ভব স্পষ্ট করে বলতে বলে।

তাই ফরহাদ মজহারকে অফেন্ড বা ডিফেন্ড করার কোনো ইচ্ছা আমার কখনো ছিলো না, এখনও নাই। ভবিষ্যতেও হবে না। উনার অবস্থানটা আমার কাছে ক্লিয়ার। আর আমার অবস্থানও উনার কাছে ক্লিয়ার না থাকার কথা নয়। উনার সাথে সরাসরি কথা না বললেও উনার 'খলিফা'দের শীর্ষস্থানীয়দের সাথে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি। সেসবের অডিও রেকর্ডও আমার কাছে আছে। হ্যাঁ, উনাদের কাছ হতে আমি অনেক কিছু শিখেছি। যার অন্যতম হলো বেহাত বিপ্লব, ইতিহাসের শ্রেণীসংগ্রাম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বস্তুবাদী মন-

মানসিকতার গভীরতা, বিস্তৃতি ও বহিঃপ্রকাশ। যার কিছু অংশ আমার নোটে 'কাকের বাসায় কোকিলের ডিম' শিরোনামে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি।

কোনো অনুষ্ঠানে বা ওয়ান-টু-ওয়ান কথা বলার জন্য মজহারের কাছে আমার কখনো যাওয়া হয় নাই। তারমানে এই নয় যে বাংলাদেশে মজহার একজনই আছেন। ফরহাদ মজহার একটা ধারা। অনুরূপ লেভেলের ও ব্র্যান্ডের লোক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে। আমার ড্রয়িং রুম, স্টাডিজ সেন্টার ও লাইব্রেরিতে এখনও শুঁকলে উনাদের কারো কারো সিগারেটের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। আমি ইন্টারেকশানের বিরোধী নই। বরং নিয়মিত চর্চাকারী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন কিংবা আছেন এমন ফুল, সেমি ও কোয়ার্টার মজহারীদের সবার সাথেই আমার খায়-খাতির ছিলো। এবং আছে। আমার এই ধরনের যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্য হলো— কী বিশ্বাস নিয়ে তারা তাড়িত, তা উপলব্ধি করা। তাদের যুক্তিগুলো শোনা।

বামপন্থীদের মধ্যে যারা মজহারবিরোধী, আমার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে যাদের কাউকে কাউকে আমি 'ঈমানদার কমিউনিস্ট' হিসাবে কখনো কখনো ঠাট্টা করে সম্বোধন করি, তাদের সাথে আমার নিয়মিত কথাবার্তা হয়। যারা আমার সমবয়সী বা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের সাথে এমন ইন্টারেকশান বেশি হয়। সলিমুল্লাহ খানের সাথে কখনো কখনো সেমিনার ইত্যাদিতে সারাদিন ছিলাম। সময়-সুযোগ মতো তাদের সাথে মেলামেশা করার চেষ্টা করেছি। ফুল-নাস্তিক, সেমিনাস্তিক বা ছুপা নাস্তিকদের পালস ও বুদ্ধিবৃত্তির দৌড় কতটুকু তা বুঝার চেষ্টা করেছি। সব সময়ে দেখেছি, তারা সমালোচনাতে যত উস্তাদ, করণীয় বিষয়ে ও ইতিবাচক তত্ত্ব-প্রস্তাবনায় ততটাই পলায়নপর, অনিচ্ছুক ও ইনকনসিসটেন্ট। কিছু যদি নিতান্তই বলতে হয়, তা ওই যে বললাম, মাল্টিলেয়ারে ও পর্যাপ্ত ভ্যাগনেসসহ বলে। ওসবে আমার আর অতটা ইন্টারেস্ট নাই।

সারারাত রামায়ন পড়ে সকালে বলে, সীতা কার বাপ?

আমার 'মজহারপন্থা'র সমালোচনা করে বিজ্ঞ পাঠক এমনও মন্তব্য করেছেন, *"যেই প্রিজম দিয়ে সমাজ দেখেন সেইটা তো সামগ্রিক না ভাই। জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় অর্থনীতি, কালচার, সাহিত্য, ইতিহাস, কনফ্লিক্টিং আদর্শের কম্প্রিহেন্সিভ বুঝ এবং সমাধান পেশ করতে না পারলে শুধু ধর্মতত্ত্বের সিংগেল প্রিজম দিয়ে সমসাময়িক মানব, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান হয় না।"*

এ যেন 'সারারাত রামায়ন পড়ে সকালে 'সীতা কার বাপ'— এমন প্রশ্ন করা! আশ্চর্য! আমি উক্ত পাঠকের অন্য একটা মন্তব্য পড়ে ভাবছিলাম, তিনি আমার লেখালেখির সাথে পরিচিত। দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো।

আমি তো ইসলামের ধর্মবাদী ব্যাখ্যাকে ভুল মনে করি। আবার ইসলামকে জামায়াতের মতো রাজনীতির লক্ষ্যে পরিচালিত ধর্ম মনে করি না। ধর্ম ও রাজনীতির অভিন্নতা কিংবা পারস্পরিক বিরোধিতার দাবিকে সমভাবে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি বলে মনে করি। আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ইসলাম এমন একটা ব্রড বাউন্ডারি, যার মধ্যে রয়েছে মানবজীবনের সব দিক সম্পর্কে মৌলিক নীতিগত নির্দেশনা। ধর্মও তার একটি। যদিও ধর্মীয় বিষয়গুলোতে ইসলাম অধিকতর সুনির্দিষ্ট, কাঠামোগত ও প্রায়োগিক নির্দেশনা প্রদান করে।

তাই, সবকিছুকে আমি ধর্মতত্ত্বের প্রিজম দিয়ে দেখি— এটি সঠিক নয়। অন্য সবার মতোই আমার বিশেষ এক বিশ্বদৃষ্টি বা প্যারাডাইম আছে। তাকে যদি প্রিজম বলা হয় তাহলে বলতে হয়, হ্যাঁ, অবশ্যই সবকিছুকে আমি তাওহীদের প্রিজম দিয়ে দেখি। অতএব, বলুন, প্রিজম ছাড়া কে দেখে, কী দেখে? দেখাদেখির বিষয়টা তো চোখ দিয়েই ঘটে। অথবা, মন দিয়ে। আচ্ছা, জ্ঞানগত দেখাদেখি না হয় জ্ঞানের আধার হিসাবে মন দিয়েই ঘটে। তো এই চোখ বা মন, যা দিয়ে আমরা দেখি, তা কার? কেন সেটি তেমনই দেখায়? যা দেখা যায়, তা কি সব সময়ে তা-ই? আমরা কার চোখ দিয়ে দেখি? কার মন দিয়ে ভাবি? প্রত্যেকেরটা তো প্রত্যেকেরই। নাকি? আমাদের চোখ বা মন কি এক একটা প্রিজম-সদৃশ নয়? তা যদি না হয়, তাহলে একই জগতের এতো ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও জ্ঞান কেন?

সমস্যা হলো, ইসলামের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের। কিছু মাজারকেন্দ্রিক ভ্রান্ত মতানুসারী ছাড়া বৃহত্তর পরিসরে মুসলমানদের ইসলামী আকীদা সহীহ হলেও কীভাবে সমকালীন বাস্তবতায় ইসলামকে কায়েম করতে হবে, ইসলাম কায়েম বলতে আসলে কী বুঝায়, এর ধাপগুলো কী হবে এবং কীভাবে সেগুলো পার হওয়া যাবে— এসব নিয়ে এমনকি ইসলামী আন্দোলনপন্থীদেরও মৌলিক তত্ত্বগত গলদ রয়েছে। এতো গেলো ভিতর দিক থেকে সমস্যা। ইসলামের বাহির থেকে যারা ইসলামিস্টদের পর্যবেক্ষণ করেন ও নানা মতলবে তাদেরকে ব্যবহার করতে চান অথবা ইসলামপন্থীদেরকে যে কোনো প্রকারে ঠেকাতে চান, তারা এ নিয়ে দুই ধরনের সমস্যার মধ্যে আছে: (১) হিস্টোরিকেল এনালাইসিস

নির্ভরতার পরিবর্তে থিমেটিক এপ্রোচে অর্থাৎ ভিতর দিক থেকে জীবনাদর্শ হিসাবে বুঝার সমস্যা। এবং (২) ইসলামপন্থীরা কী করতে চায় তা উপলব্ধি করার সমস্যা। অবশ্য, এই দ্বিতীয় সমস্যাটা, এক অর্থে, কমন প্রবলেম। বোথ ইসলামপন্থী, সুযোগসন্ধানী ও বিরোধী পক্ষের। যে কারণে অর্থাৎ ইসলামকে মূলত ধর্ম মনে করার কারণে আমি ইসলামপন্থীদের সব সময়ে সমালোচনা করি, আমার উপরে সেটিই বিজ্ঞ মন্তব্যকারী আরোপ করেছেন। উনার বিশেষ প্রিজমের আলোকে উনি এমনটা দেখছেন। এ ছাড়া এ ধরনের উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা কেন তা বুঝতে পারছি না।

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জনপরিমণ্ডলে জামায়াত হলো একটা ট্যাবু

বিজ্ঞ মন্তব্যকারীর ভাষাটা দেখুন। তিনি বলছেন, *“আপনি কিছু জামায়াতী ওনা-পানা করলেন যেটা খুব ভালো ঠেকেনি। কিশোরসুলভ হয়ে গেলো মনে হয়েছে।”* আমার এলাকায় আমি এক সময়ে শিবিরের নেতা ছিলাম। কর্মজীবনের বৃহদাংশে সেখানকার জামায়াত নেতা ছিলাম। এখন আমি জামায়াত-শিবিরকে ডিজওন করে নিজের মতো কাজ করছি। জামায়াতের সমালোচনা করে আমি ২০১০ সাল হতে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা লিখেছি তা সংকলন করলে কয়েকশত পৃষ্ঠার একটা গ্রন্থ হবে। এমন একটা গ্রন্থ প্রকাশের চিন্তাভাবনাও আমি করছি। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় আগামী দিনের উপযোগী ইসলামী আন্দোলনের রূপরেখা, কর্মপদ্ধতি ও তাত্ত্বিক ভিত্তি কেমন হওয়া উচিত, সেসব নিয়ে আমার লেখাগুলোর সংকলন করা হলে তাও কয়েক শত পৃষ্ঠার আরেকটা গ্রন্থ হবে। দলনিরপেক্ষ সমমনাদের নিয়ে আমার এ কর্মপ্রয়াসকে যাতে জামায়াতের সংস্কার প্রচেষ্টা মনে করা না হয় তার জন্য আমি দীর্ঘ নোট লিখেছি। অথচ একে সম্মানিত মন্তব্যকারী ‘জামায়াতী ওনা-পানা’ হিসাবে বিবেচনা করলেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। কারণ, জামায়াত হলো বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জনপরিমণ্ডলে একটা নিষিদ্ধ জিনিস বা ট্যাবু।

জামায়াত প্রসঙ্গে লিখবেন? কিছু বলবেন? আপনাকে সর্বাংশে জামায়াতের বিরোধিতাই করতে হবে। একে সদাসর্বদা ভিলেন হিসাবে দেখাতে হবে। কোনোক্রমেই জামায়াতের পক্ষে যায় এমন কোনো কথা বলতে পারবেন না। বললে আপনি নিঃসন্দেহে জামায়াত, অন্ততপক্ষে ছুপা জামায়াত। যদ্দুর জানি, তাবৎ জামায়তাবিরোধীরা আমাকে জামায়াত হিসাবেই বিবেচনা করে। কারণ,

আমি জামায়াতের ইতিবাচক দিকগুলোকে স্ট্রংলি এক্সপোজ করি। 'কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই' শীর্ষক নোটের শেষের দিকে আমি এ দেশে জামায়াতের লেজিটেমিসির দিকটার ওপর মন্তব্য করেছি।

শুধু আমি কেন, অপরাপর বামপন্থীদের দৃষ্টিতে ফরহাদ মজহারও জামায়াত। ওই যে জামায়াত-ট্যাবু! জামায়াতকে যে ধুয়েমুছে দিবে না, সে আদতে জামায়াত! এক দৃষ্টিতে অনেক ব্যর্থতার মাঝে এটি জামায়াতের অন্যতম প্রধান অর্জন বৈকি (?)। কেননা, যারাই ইসলামের সামাজিক ও বৃহত্তর প্রয়োগযোগ্যতার কথা বলেছে তারা সবাই 'প্রগতিশীল'দের দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো পর্যায়ের জামায়াত।

নোট না পড়েই দীর্ঘ আক্রমণাত্মক বক্তব্য

আলোচ্য 'সহৃদয়' পাঠক শেষ পর্যন্ত নিজের মন্তব্যে নিজেই প্রমাণ করলেন যে তিনি আমার নোটটা ভালো করে পড়েন নাই। পড়লে উনি এই মন্তব্যটি করতেন না: *"আপনার যদি ফরহাদ সাহেবের কোনো মতামতের বা দর্শনের সুনির্দিষ্ট সমালোচনা, পর্যালোচনা থাকে তাহলে জানালে উপকৃত হতাম"*

'কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই' শীর্ষক নোটের ১ম পর্বে উক্ত পাঠক মন্তব্য করেছেন, "... এগুলো সমস্যার 'কী' নিয়ে আলোচনা, কিন্তু 'কেন'র কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আপনার আগের লেখাগুলোরই পুনরাবৃত্তি দেখলাম।" তাতে মনে হলো তিনি আমার লেখালেখির সাথে পরিচিত। অথচ আমি যে প্রথম থেকেই ফরহাদ মজহারের সাথে কোনো প্রকার বাহাসে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক তা কীভাবে তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো? মজহারপন্থা নিয়ে আমার উক্ত নোট লেখার কারণ হলো জামায়াতের লোকদের বুদ্ধিবৃত্তিক হীনমন্যতাবোধকে উন্মোচিত করা এবং উনার সাথে যারা আমাকে বসাতে চান তাদের কাছে ফরহাদ মজহার ও আমার বেসিক লাইন অব থট বা প্যারাডাইমগত ভিন্নতার বিষয়টা ক্লিয়ার করা। জামায়াতের এই মজহারভক্ত সংস্কারবাদীরা আমাকে বারম্বার অনুরোধ করে বাধ্য করেছেন উনার লন্ডন বক্তৃতার ওপর কিছু পর্যালোচনামূলক লেখা লিখতে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি (১) "ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর", (২) "ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পার্থক্য", (৩) "সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কি ইসলামের লক্ষ্য?" এবং (৪) "মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার" শীর্ষক

চারটি বড় প্রবন্ধ লিখেছি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমার ধারণায় উক্ত জামায়াত ঘরানার মজহার ভক্তবৃন্দ এগুলোর কোনোটাই ভালোমতো পড়েন নাই।

দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য মন্তব্যকারীও এগুলো পড়েন নাই। অথবা, মজহার ভক্তকূলের মতো একটু নজর বুলিয়েই ‘কারজাভীর ইসলাম এমন’, ‘মওদূদীর ইসলাম তেমন’ ধরনের গ্রস মন্তব্য করছেন। আগে পড়ুন। বিশেষ করে প্রথম তিনটি লেখা মৌলিক। ভালো করে পড়ুন। এরপর মন্তব্য করুন।

এরপরও কীভাবে ইসলামপন্থীরা মজহারবাদী হয়!

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ ‘ঈমানদার কম্যুনিস্ট’ ফরহাদ মজহার হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো বুদ্ধিজীবিতার এক হীনমন্যতাসুলভ দুর্দান্ত আকর্ষণে এ দেশের স্মার্ট ইসলামিস্টদের একটা বিরাট অংশকে তাদের অজান্তেই বশীভূত (indoctrinate) করে রেখেছেন। ভদ্রলোক এক ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। এই বয়সে মাশাআল্লাহ যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, ভাবছি এতদিন বাঁচবো নাকি!

যাহোক, ক’দিন আগে মজহারপন্থার মুখোশ উন্মোচন করে জনাব শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকী “তবু ইসলামের কথাই বলতে হবে... (কমিউনিজম প্রশ্ন)” শিরোনামে একটা সুলিখিত প্রবন্ধ লিখেছেন। ইচ্ছা করেছিলাম লেখাটা শেয়ার করবো। পরে ভাবলাম লেখক যদি কখনো লেখাটা মুছে দেন তাহলে তো আমার শেয়ারিংটা মাঠে মারা যাবে। সে জন্য ভাবলাম পুরো লেখাটা কপি করে আমার টাইমলাইন হতে শেয়ার করে নিচে লেখকের নাম উল্লেখ ও ট্যাগ করে দেই। এরপরে আবার ভাবলাম, ইসলামপন্থীদের মজহারপন্থা অনুসরণের বিষয়ে আমি যেসব লেখা লিখেছি এবং/অথবা শেয়ার করেছি সেসবের একটা সংকলন আগ্রহী পাঠকদের জন্য একটা নোট হিসাবে দেই। পরে সেটি খুঁজে পেতে ও সময়ে সময়ে এডিট করতে সুবিধা হবে।

হীনমন্য উঠতি ইসলামপন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একজনও এসব লেখার কোনো একটা যুক্তিকে অন্তত গ্রহণ করবে, এমনটি আমি আশা করি না। ক’বছর যাবত এই ব্যর্থ চেষ্টা করে করে আমি ক্লান্ত ও বিরক্ত। জাতে উঠার এক উদগ্র মোহে তারা ব্যতিব্যস্ত। তৎসত্ত্বেও ইসলামকে যারা জীবনাদর্শ হিসাবে মনে (own) করে, এমনসব তরুণদের উদ্দেশ্যে এই সংকলন। এবং এতে আমার একপ্রকার দায়শোধ বা দায়িত্ব পালনের মতো আত্মতুষ্টিও রয়েছে। যাহোক, আপাতত এই লেখাগুলো পড়ুন। যে কোনো প্রস্থের মন্তব্যকে স্বাগত জানাই, যদি তা ব্যক্তি-আক্রমণমূলক না হয়।

কথার ওস্তাদ জনাব ফরহাদ মজহারের (একদা ও বর্তমান ভক্তকূলের ভাষায় ফরহাদ ভাই) লন্ডনের ম্যানচেস্টারে প্রদত্ত বক্তৃতার[১] প্রতিক্রিয়ায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে সরাসরি বক্তৃতাটির খণ্ডন না করে এর কিছু বেসিক প্রপজিশানকে রিফিউট করে নিচের প্রথম চারটি লেখা প্রকাশ করেছিলাম। লন্ডনে তিনি কয়েকটি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এখন দেখছি এই ভিডিওটির ইউটিউব লিংক ভিজিট করলে "...terminated due to multiple third-party notifications of copyright infringement." এই মেসেজ দিচ্ছে। অবশ্য আমি তখন সেটা নামিয়ে রেখেছিলাম। যাহোক, একই সময়ে তিনি লন্ডনের ওয়াটারলিলিতে পরের দিন অনুরূপ একটা বক্তৃতা দেন, যা ইউটিউবে পাওয়া যায়। সরকারবিরোধী বক্তৃতার আড়ালে তিনি যে দ্বীনে ইলাহির সবক দিয়েছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সরাসরি মিথ্যা কিংবা আগাগোড়া ভুল কিছুকে মানুষ সহজে চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু যেসব কথায় সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে থাকে তা খুবই ডেঞ্জারাস। ক্ষেত্রবিশেষে মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর। যেমন ইসলাম সম্পর্কিত মজহার বয়ান সমগ্র। উনার কিছু কথা নিতান্তই হক। কিছু কথা ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। আর কিছু কথা অবভিয়াসলি ফলস। আমি বুঝি না উনাকে কেন লোকেরা ফিলোসফার ভাবে! প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ফিলোসফি থাকে। না থাকার কোনো সুযোগ নাই। কেউ কেউ নিজ দার্শনিক অবস্থানের পক্ষে কিছু দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করেন। এর মানে এই নয় যে তিনি নিজেও একজন ফিলোসফার। ফরহাদ মজহার হলেন কম্যুনিস্ট এক্টিভিস্ট। ফিলোসফার নন। উনি ফেনোমেনোলজি নিয়ে পাঠচক্র চালান। তার জন্য যদি উনাকে ফিলোসফার বলা হয়, তাহলে তো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ফিলোসফি টিচারই এক একজন ফিলোসফার বটে।

প্রসঙ্গটা এজন্য টানলাম, বিশেষ করে ইসলাম নিয়ে মজহার সাহেবের চিন্তাগত অসম্পূর্ণতা ও অসততা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরে কেউ কেউ অস্বস্তিতে ভুগে বলেছেন, "উনি তো ফিলোসফার। আমি ফিলোসফি বুঝি না।" না বুঝার কী আছে? কোনো কিছু বুঝার জন্য সেই ডিসিপ্লিনের নির্দিষ্ট টার্ম ব্যবহার জরুরি নয়। বিশেষ করে ফিলোসফির সাথে ব্যক্তিগত এটাচমেন্ট এবং প্রফেশনাল অভিজ্ঞতা হতে এটি দাবি করে বলতে পারি। আমার কথা পরিষ্কার,

---

[১] বক্তৃতাটির অনুলিখন এই বইয়ের পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে।

বুঝেশুনে যিনি ঈমান এনেছেন, ইসলামকে বুঝেছেন, অন্তত ইসলাম বুঝার জন্য তার ফিলোসফার হওয়ার দরকার নাই। সবচেয়ে নিখুঁত ফিলোসফিকে তিনি অলরেডি সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতিতে বুঝে নিয়েছেন। হতে পারে নিজের এ বুজুর্গি সম্বন্ধে তিনি অবহিত নন।

১. “ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার সমস্যা ও ইসলামে দর্শনের পরিসর” (https://cscsbd.com/890)

২. “ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পার্থক্য” (https://cscsbd.com/918)

৩. “সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কি ইসলামের লক্ষ্য?” (https://cscsbd.com/960)

৪. “মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার” (https://cscsbd.com/951)

৫. “কেন আমি জামায়াতের সংস্কারবাদী নই (পর্ব ২): মজহারপন্থা” (https://mozammelhq.com/post/113#part-3)

৬. “চিন্তার প্যারাডাইম, প্যারাডাইমের পরিবর্তন ও চিন্তাগত উন্নয়ন প্রসঙ্গে কিছু প্রতিমন্তব্য” (https://mozammelhq.com/post/233)

৭. জনাব Adnan Yusuf Hasan লিখিত **“একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের গ্র্যান্ড প্রজেক্ট: হ্যামিলিয়নের বাঁশিওয়ালা ও ইঁদুরের গল্প”** (www.facebook.com/adnanYhasan/posts/1634349823454915)

৮. জনাব জগলুল আসাদ লিখিত **“বাংলাদেশে ইসলাম চিন্তার নানা ধারা ও চিন্তকগণ” (পর্ব-১)** (https://cscsbd.com/1406) এর ০২ নং পয়েন্ট হতে উদ্ধৃত:

“বাংলাদেশের তরুণদের একটা অংশ বর্তমানে ইসলাম নিয়ে ভাবছেন, লিখছেন ও পড়ছেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ধারা আমি লক্ষ্য করেছি। একটি ধারা মূলত মার্কসবাদী। তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কৌশল হিসেবে ইসলামের একটা অবয়ব নির্মাণ করতে চান। তবে এদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা প্রথাগত বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত নন। কেউ আবার

আস্তিক। কেউ ঘোষিত বা অঘোষিতভাবে নাস্তিকও বটে। ইসলামের ইতিহাস থেকে তারা তাদের পছন্দসই ইতিবাচক উদাহরণ সংগ্রহ করে নিজেদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভাবনার উপযোগী করে ব্যাখ্যা করেন। এরা মূলত ইতিহাস আশ্রয়ী। ইসলামের মৌলিক টেক্সট 'কোরআন ও হাদীস' থেকে তারা খুব কম উদাহরণ টানেন। ইতিহাসে ইসলাম চর্চার বৈচিত্র্যের ধারা উনারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন। খুব সহানুভূতি ও সংবেদনশীলভাবে তারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনা (পর্যালোচনা?) হাজির করেন। ধর্মের ঐশিত্ব (divinity) নিয়ে তারা সাধারণত প্রশ্ন করেন না। ইসলামকে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করে 'গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও সেক্যুলার' সমাজের উপযোগী করে ইসলামকে উপস্থাপন করতে তারা উদ্যোগী ও উৎসাহী। ইসলাম ধর্মাবলম্বী বা ইসলাম পালনকারী একজন হিসেবে তারা কথা বলেন না। বরং compassionate observer হিসেবে ইসলাম প্রশ্নে তারা আলাপ তোলেন। এ ধারারই একটি অংশ মার্কসীয় পরিভাষা ব্যবহার করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন অথবা ইসলামী পরিভাষার মার্কসীয় ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন।"

৯. "তবু ইসলামের কথাই বলতে হবে... খসড়া-০৩ (কমিউনিজম প্রশ্ন)" শিরোনামে শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকীর লেখা নোট হুবহু উদ্ধৃত:

"আমরা যখন ইসলামকে এই দানবীয় সভ্যতার নজরদারি ও আধিপত্য উচ্ছেদে মানবজাতির শেষ এবং একমাত্র গন্তব্য বলছি। এবং বলছি যে এ কোনো নতুন কথা নয়। ইতিহাসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা সাক্ষ্য দিচ্ছে— শুধু ইসলামই ফিরে আসে। ফিরে এসেছে যুগে যুগে, ইসলাম নামেই। তার আরেক মানে হলো— মানবজাতির দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম তথা জালিম-মজলুমের লড়াইয়ের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসেরই একটা বিস্তৃত ও উজ্জ্বল অংশ। কথাগুলো আমরা মোটেই আবেগে বলিনি। কমিউনিজমের 'খোদা এবং অবতার' কার্ল মার্ক্সকে টেনে এনেই বলেছি। মানবজাতির অজস্র সহস্র বছরের ইতিহাসকে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই প্রিমিটিভ কমিউনিজম নাম দিয়ে গায়েব করে চট করে হালের দাস যুগে চলে আসা ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ তো নয়ই, বস্তুনিষ্ঠ পাঠও হতে পারে না। একই কথা মধ্যযুগ/ধর্মযুগ/সামন্তযুগ ইত্যাকার প্রোপাগান্ডার ব্যাপারেও প্রযোজ্য। রক্ত-হৃদয়-বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাঙ্গ মানবিক অনুভূতিতে রচিত ইতিহাসের উজ্জ্বলতম পৃষ্ঠাগুলো না বোঝা কিংবা বুঝতে না চাওয়ার স্পর্ধা নিয়েও বলেছি। আমাদের শেষ কথা ছিলো— সো, যা'ই হয়েছে, আর যা'ই হচ্ছে কিংবা হোক,

মানবজাতিকে, আজ হোক কাল হোক, সেই ইসলামের কথাই বলতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন কমিউনিজমের কী হবে?

বিশেষ করে বাংলাদেশের ‘ভালো’ ইসলাম-জানা সম্ভবত একমাত্র কমিউনিস্ট ফরহাদ মজহার যখন বলছেন— ‘তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে...।’ এখন নয়, বলছেন ২০১২ সাল থেকে। সে লেখা ২৪ এবং ২৫ ডিসেম্বর ছাপা হয়েছিলো তখনকার তুমুল জনপ্রিয় দৈনিক আমার দেশে। ভিন্ন নামে এসেছিলো নয়া দিগন্তে, ১২ মে ২০১৬সা লে। ‘চিন্তা’র ওয়েবসাইটে এখনও নিশ্চয়ই আছে। তার ভাষায়:

‘...কমিউনিজম শেষ হয়ে গেছে এটা একটা বাজে গুজব’। ‘বরং আমাদের দাঁড়াতে হবে কমিউনিজমেরই পক্ষে, যেখানে আস্তিক/নাস্তিকের ভেদ দিয়ে রাজনীতি ঠিক হয় না, ঠিক হয় কে জালিম আর কে মজলুম সেই বিভাজন দিয়ে।’

তারপর সেই কমিউনিজমের কর্মযজ্ঞের বিস্তৃতি নিয়ে বলেছেন— ‘...গরিব ও নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে কমিউনিজম সন্তুষ্ট নয়, ... বরং নিপীড়িতের নজর দিয়ে জগত ও ইতিহাসকে দেখা, সব কিছুকেই নিপীড়িতের নজরদারির মধ্যে আনা এবং সব মানুষের স্বার্থ রক্ষার রাজনৈতিক নীতি ও কৌশল সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করা।’

অসাধারণ! হাউ নাইস আ ‘কমিউনিজম’! শুধু এটুকুন নয়, পুরো লিখাটাই অসাধারণ! বিশেষ করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনগুলোর দিক থেকে। এটি তাদের অবশ্য পাঠ্য হতে পারে। এবং যত দিন না তারা তা আত্মস্থ করতে পারছে, তত দিন সেটি নিত্য পাঠ্যও হতে পারে। আবার কমিউনিস্টদের সাথে অন্তত বাংলাদেশে ইসলামপন্থিদের কথা বলার, একটু মুচকি হাসি বিনিময় করার, দিগন্ত উন্মোচিত করার জন্য তিনি ব্যাপক সাধুবাদও পেতে পারেন। পেতে পারেন নয়, আমরাও উনাকে সাধুবাদ জানিয়ে প্রসন্নবোধ করতে চাই।

কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখবেন, ‘তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে...’ বললেও, উনার আত্মবিশ্বাসে ‘মজাদার’ রকমের ঘাটতি আছে। সেই সাথে অন্যের মাথায় কাঠাল ভেঙে খাওয়ার চিন্তাও লক্ষণীয়। দেখুন:

'...কমিউনিজম শেষ হয়ে গেছে এটা একটা বাজে গুজব। জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই যতদিন থাকবে ততদিন কমিউনিজম কায়েমের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোনো ঘাটতি হবে না। হতে পারে ভিন্ন নামে, হয়তো ভিন্ন পতাকা হাতে তার আবির্ভাব ঘটবে। হয়তো ভিন্ন ঐতিহাসিক আর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাকে যেভাবে বুঝেছি সেই বোঝাবুঝির মধ্যে ভুল আছে, অসম্পূর্ণতা আছে।'

কমিউনিজম শেষ হয়ে গেছে এটা একটা বাজে গুজব। ঠিক কথা। আমরাও বলি, কমিউনিজম মোটেই শেষ হয়নি। বাংলাদেশের মতো একটি বিপুল সংখ্যাধিক্যের মুসলিম দেশে ইসলাম সম্পর্কে সমূহ জ্ঞানের অধিকারী ফরহাদ মজহারের মতো চিন্তাবিদ-দার্শনিক যদি নিজেকে কমিউনিস্ট পরিচয় দিতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেখানে আমরা কী করে বলি যে কমিউনিজম শেষ হয়ে গেছে!... 'জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই যতদিন থাকবে ততদিন কমিউনিজম কায়েমের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোনো ঘাটতি হবে না।' তাও সত্য, আসলে কিছু মানুষ তো থাকবেই। কিন্তু গণ্ডগোল হলো 'হতে পারে ভিন্ন নামে, হয়তো ভিন্ন পতাকা হাতে তার আবির্ভাব ঘটবে' নিয়ে। এর মানে কী? এ কথাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ! এটা বুঝলে আমরা হয়তো পরের লাইনটিও বুঝে ফেলতে পারবো। তো 'ভিন্ন নামে' 'ভিন্ন পতাকা হাতে'র মানে কী হতে পারে? মানে কি এই নয়– হে দুনিয়ার কমিউনিস্টরা! জালিমের বিরুদ্ধে মজলুম যদি কোথাও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় – হতে পারে 'ভিন্ন নামে' 'ভিন্ন পতাকা হাতে' – তাদেরকে তোমরা অপর ভেবো না? চমৎকার ব্যাপার! এতো প্রসঙ্গান্তরে আল্লাহর কথারই প্রতিধ্বনি–

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আজ আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমত দান করেছি, কাল যদি অন্য একজন রাসূল এই শিক্ষার সত্যতা ঘোষণা করে তোমাদের কাছে আসে, যা আগে থেকেই তোমাদের কাছে আছে, তাহলে তোমাদের তার প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে... ।" (সূরা আলে ইমরান: ৮১)

যদি তাই হয়, এবং যদি কমিউনিজমের উপর আমরা এতোদূর আস্থা না রাখতে পারি যে কমিউনিজম স্বনামে, স্ব-নীতি কৌশলসহ হাজির হবে, তাহলে 'তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে...' বলার কী অর্থ? জালিমের প্রতিপক্ষ হিসেবে যদি 'অন্যকিছু'ই ভিন্ন পতাকা হাতে ভিন্ন নীতি-কৌশল নিয়ে আরো

প্রবলভাবে মজলুমের পক্ষে হাজির হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, তাহলে শুধু শুধু কমিউনিজমের কথাই-বা বলতে হবে কেন? এটা কি ফরহাদ ভাই প্রতীকী অর্থে বললেন? নাকি এর আভিধানিক অর্থ সাম্য, সমতা ইত্যাদি অর্থে? সে রকম কিছু হলে তো অত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলার দরকার নেই যে 'তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে...'

তাছাড়া কমিউনিজমে যেহেতু ঈমান-বেঈমানের ব্যাপার নেই, স্বর্গ-নরক টাইপ কোনো ধর্মীয় সংস্কার নেই; সুতরাং, তা থেকে বেরিয়ে আসা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও অনেক সহজ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তারপরও তিনি কমিউনিজম ছাড়বেন না! কারণ, জালিম আর মজলুমের লড়াই মানেই কমিউনিজম! 'কমিউনিজমকে যে নামেই ডাকি, কিছুই আসে যায় না'। যদি ভিন্ন কোনো নামে জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই জারি হয়, সে লড়াই তিনি মেনে নেবেন বটে, কিন্তু চিহ্নিত করবেন কমিউনিজম হিসেবে! আগামীকাল যদি ইসলামও এ লড়াইয়ে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করে (যদিও ইসলাম সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, সেই হাবিল-কাবিল থেকে কোনো অবস্থায় জালিমের প্রতিপক্ষে তার লড়াই মুলতবী রাখেনি এবং ভবিষ্যতের শেষ সম্ভাবনাময় দিনটি পর্যন্ত — ইলা ইয়াওমাল কিয়ামাহ — তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখবে, সে প্রসঙ্গে আমরা একসময় বলবো) তারপরও তিনি ইসলামকে কমিউনিজম নামেই চিহ্নিত করবেন। এবং বলবেন— ইসলাম কমিউনিজমেরই অন্য নাম, 'কমিউনিজমকে যে নামেই ডাকি, কিছুই আসে যায় না'...

এ যেনো ভুল প্রেমিকার প্রতি অর্থহীন, ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বংসাত্মক, পক্ষপাতিত্ব! ওরা কখনোই সর্বান্তকরণে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় না। প্রয়োজনে মুর্তাজা (আল্লাহর প্রিয়) অভিধায় সিক্ত হযরত আলীকেও কমিউনিস্ট বানিয়ে নেবে! উম্মতের লুকমান আবু যর গিফারীকে বানিয়ে দেবে সমাজতন্ত্রী! এবং কমিউনিস্টদের মুমিন হতে না বলে, উল্টো বলে দেবে— '...তোমরাই মুমিন'...

প্রথম প্রেমের স্মৃতি একটু বেশিই দাগ কাটে ঠিক, কিন্তু তাকে অনর্থ আশায় নিরন্তর বয়ে বেড়ানো কতটুকু ঠিক? কিছুটা আরাম হয়তো বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত যন্ত্রণা লালিত হয়ে শাখা-প্রশাখা ছড়ায়! তাতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই ক্ষতি বৈ উপকার হয় না...

'...হয়তো ভিন্ন ঐতিহাসিক আর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাকে যেভাবে

বুঝেছি সেই বোঝাবুঝির মধ্যে ভুল আছে, অসম্পূর্ণতা আছে'। ভালো কথা। যে কোনো মতাদর্শই যখন তার 'স্থানিক ও কালিক' রূপায়ণের ক্ষেত্রে গিয়ে বড় কোনো ব্যর্থতায় নিপতিত হয় — যা হতে পারে বলে সে মনে করতো না — সেক্ষেত্রে ব্যর্থতা-পরবর্তী সময়ে তার অনুরাগী কর্মী-সমর্থকদের মাঝে এ ধরনের ভাবনা উদয় হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এখন কেউ যদি মনে করে সেই 'ভুল' এবং 'অসম্পূর্ণতা' নতুন বাস্তবতায় অতিক্রম করা সম্ভব, তাহলে তিনি তা তার মতাদর্শের দিক থেকে তা করতে চাইতেই পারেন।

অর্থাৎ, ফরহাদ মজহার যদি 'বদ্ধ, সংকীর্ণ ও ইসলামী আতঙ্কের রুগী হয়ে বাংলাদেশে হাজির' থাকা কমিউনিজমকে নতুন করে নির্মাণ করতে চান, সেজন্য যদি 'কমিউনিজমের দিক থেকে ধর্মকে বিচার করবার সঠিক নীতি ও কৌশল সম্পর্কে' নিরন্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং যদি মনে করেন— 'আমাদের দেশে আগামী দিনে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী আদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হলে ইসলাম প্রশ্নের একটা মীমাংসা দরকার।' এবং কমরেডদের 'এই বাস্তবতাটুকু' মানানোর কায়মনো প্রয়াস চালান যে 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম নিয়ে আলোচনা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নাই।' এবং 'সেই দিক থেকে কমিউনিস্টদের মধ্যে কীভাবে আলোচনা হলে তা সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে সেই দিক নিয়েও' বিস্তর চিন্তা-গবেষণা করেন। তাহলে তাতে কারো কোনো বিশেষ মাথাব্যথার কারণ থাকতে পারে না।

কিন্তু কেউ যদি 'আধা ইসলাম আধা কমিউনিজমে'র নতুন কোনো দীন-ই-ইলাহী রচনার স্বপ্নে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তাহলে সমূহ মাথাব্যথার অবকাশ আছে বৈ কি! এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে ইনসাফ প্রশ্নে ইসলাম কোনো ধর্মে বর্ণে আপস করে না। একজন একচ্ছত্র খলিফার বিপরীতে একজন সামান্য বিধর্মী ইহুদীর মামলা জেতা ইসলামের ইতিহাস নিতান্তই স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত। একইভাবে জালিম-মজলুমের দ্বন্দ্বেও আস্তিক-নাস্তিক ভেদ ইসলাম অস্বীকার করে। ইসলাম বলে— মজলুম আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না। আপনার মুসলমান ভাই যদি জালিম হয়, তার নির্বিচার পক্ষপাত নয়, বরং তাকে জুলুম থেকে বের করে নিয়ে আসুন— এটাই আপনার ভাইয়ের জন্য সাহায্য (হাদীস)। ইসলাম বলে— আল্লাহ নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছেন, হারাম করেছেন তার বান্দাদের উপরও (হাদীসে কুদসী)।

এই হলো ইসলাম। একজন মুসলমান যখন জালিমের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ায়,

তখন তার ঈমানী দায়িত্ব থেকেই দাঁড়ায়, মুসলমান হিসেবেই দাঁড়ায়, পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি থেকেই দাঁড়ায়। মায়ের কাছে নানার বাড়ির গল্প বলার মতো এখন কোনো পক্ষ যদি জালিম ও মজলুমের দ্বন্দ্বে এতটাই অনর্থ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন যে তারা আস্তিক-নাস্তিক ভেদ রাখতে চান না, বলেন 'পরকালের কথা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই বরং মুমিনের কাজ।' তাছাড়া 'পরকালের কথা তো আমরা ইহকালেই বলি।' সুতরাং, ইহকাল-পরকালের ব্যাপার একপাশে রেখে 'রাজনীতিটা' ঠিক করো। বাক্যের মারপ্যাঁচে চট করে ধরা না গেলেও, এ ধরনের কথা যারা বলেন, প্রকারান্তরে তারা ইসলামের ভিত্তিমূলেই আঘাত করেন। তাওহীদ-রিসালাত-আখিরাতের ভিত্তিভূমি থেকে মুসলমানদের ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের করে নিতে চায়।

তারা হয়তো মানবতার প্রতি কোনো সদিচ্ছা থেকেই করতে চাইছেন। কমিউনিস্ট ও ইসলামিস্টদেরকে এক করার অভিপ্রায় থেকেও তা হতে পারে। কিন্তু এটা যথার্থ উপায় নয়। উপায়-পথ-পন্থা নিয়ে নানা চিন্তা হতে পারে। বুঝতে হবে যে 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন' মানে সেক্যুলারিজম নয়। আস্তিকতা-নাস্তিকতা এক করে ফেলা নয়। ইহকাল-পরকালের ভেদ তুলে দেয়া নয়। আবার মানবিক সম্পর্কের দিক থেকে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবরুদ্ধতাও নয়।

সেখানে মদীনার রাষ্ট্রের মতো অভূতপূর্ব উদার রাজনৈতিক সংস্কৃতি কিংবা পরিসর থাকতে পারে, হুদাইবিয়ার সন্ধির মতো শান্তির জন্য কুণ্ঠাহীন ছাড়ও হতে পারে। হবে কিন্তু ভেদ-অভেদ বিবেচনায় রেখেই, দেউলিয়া হয়ে নয়।

যদিও ইসলাম মতাদর্শগতভাবে সেল্ফ-প্রটেক্টেড, কেউ চাইলেই একটা ব্যাখ্যা দিয়ে পার পেয়ে যাবে তা সন্দেহাতীতভাবেই অসম্ভব। তবু যে কোনো বিকৃতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপই ঈমানদারের কাজ। কারণ, ইসলাম নিয়ে মানবজাতি যেখানে যতটুকু বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে, সেখানে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিকভাবে ততটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হতে হয়েছে।

সুতরাং, 'ভুল' এবং 'অসম্পূর্ণ' প্রমাণিত কমিউনিজম কিংবা আধা-ইসলাম আধা-কমিউনিজম নয়, একত্বের ধর্ম সমস্ত খণ্ডায়নের তীব্র প্রতিপক্ষে—

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ ছেড়ে দেবে?"

আমাদেরকে বরং সেই সন্দেহাতীত নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের কথাই বলতে

হবে এবং পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে ইসলামেই, কুরআনের ভাষায়:

“তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না”

১০. শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকীর **“তবু ইসলামের কথাই বলতে হবে... খসড়া-০৪”** শীর্ষক লেখাটি হুবহু উদ্বৃত:

‘কমিউনিজম প্রশ্নে’ আমরা যে আলোচনা তুলেছিলাম তার দুটি প্রধান প্রসঙ্গ ছিল। একটি হলো, জালিম ও মজলুমের লড়াই নিয়ে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ছিল: জালিমের প্রতিপক্ষে ইসলামের ইতিহাস মানব ইতিহাসের প্রথম দিনের মতো পুরোনো। জালিমের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান কমিউনিজম কিংবা অন্য যে কোনো ধর্ম বা মতাদর্শের চেয়ে অনড় এবং অবিসংবাদিত। অনেক বেশি সূক্ষ্ম, গভীরতর এবং ব্যাপক। সেইসাথে কুণ্ঠাহীন প্রকাশ্য, দৃশ্যমান, দৃঢ় এবং তীব্রতরও বটে। সেটি স্বয়ং ইসলামের প্রভু, তাঁর কিতাব কিংবা তাঁর রাসূলের জীবন, যা-ই বলুন না কেন, সবক্ষেত্রে সমান ও সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু, ‘...ইসলাম একাট্টা একরকম নয়। কুরআন নিজের তাফসীর নিজে করে না, করে মানুষেরাই। আর মানুষের মধ্যে যদি জালিম-মজলুম ভেদ থাকে সেই তাফসীরের মধ্যেও জালিম মজলুম ভেদ আছে’— ফরহাদ মজহাররা যখন এভাবে বলে ওঠেন, তখন আমরা যারা অল্পসল্প ইসলাম জানা সাধারণ মানুষ, সহসা হয়তো বুঝে উঠতে পারি না, তিনি কী বোঝাতে চাইছেন।

তবে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে— যে কিতাব জালিমের জন্য যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না (১৭:৮২), আর যাই হোক — বোঝাপড়া যতই যুগের ধুলোয় ধূসরিত হোক, ফিকাহগত হাজারো বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা থাকুক — সেই কিতাবের তাফসীর জালিম পক্ষের ইন্ধন হতে পারে না। হলে সেটি আর কুরআনের তাফসীর থাকে না। সেটি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যানযোগ্য অন্য কিছু হয়ে উঠে।

০২.

তারপর যে বিষয়টি মাথায় আসে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: কুরআনের একাংশ অন্যাংশের তাফসীর। অর্থাৎ, কুরআনের কোনো একটি আয়াতের এমন কোনো

তাফসীর গ্রহণযোগ্য নয়, যা অন্য কোনো আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক।

আগেই বলেছি, এটা সেই ধর্ম নয়— যার 'গভীরতা আছে, কিন্তু কোনো কাঠামো নেই।' আবার সেই ধর্মও নয়, নবীর তিরোধানের পর থেকেই ধর্মগ্রন্থের যেখানে বছর বছর নতুন সংস্করণ বেরোয়। এটাও বলে রাখা প্রাসঙ্গিক যে এটি সেই মতাদর্শও নয়, যার নিজের বলে কিছু নেই, যা আছে সবই ধার করা এবং যা সমাজতন্ত্রের মতো অন্য কোনো মতাদর্শের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভাবিত, পরিবর্তিত এবং নিয়ন্ত্রিত।

বরং ইসলাম, অন্য সমস্ত ধর্ম ও মতাদর্শ হতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অনন্য। অন্য কিছু না থাকলেও ইসলাম থাকে, তাকে থাকতেই হয়। আবার অন্য কিছু থাকলে তো তাকে থাকতে হয় আরো প্রবলভাবে, থাকেও। এজন্যই কিন্তু ইসলাম কোনো ধর্ম বা মতাদর্শের মূলোৎপাটন চায় না। বরং উল্টোটাই যেনো সত্য! ইসলাম চায় অন্য সমস্ত ধর্ম ও মতাদর্শকে সহাবস্থানে রেখে তার ভ্যালিডিটি প্রমাণ করতে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কিন্তু সে জন্যই পাঠিয়েছেন! অন্য সমস্ত মতাদর্শের চেয়ে ইসলাম যে শ্রেষ্ঠতম তা তাত্ত্বিকভাবে (মৌখিক সাক্ষ্য) এবং কায়েম করে (বাস্তব সাক্ষ্য) বিশ্ববাসীকে হাতে কলমে দেখিয়ে দেয়ার জন্য (৬১:০৯)।

এবং তা করতে গিয়ে ইসলাম মোটেই জোর-জবরদস্তির আশ্রয় নেয় না, নিতে পারে না। এটি করলে যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে! বরং ইসলাম বলে:

'দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই । ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে (০২:২৫৬)।

০৩.

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো?

ইসলাম মূলত একটাই। অখণ্ড। কোনো বিশেষ বাইনারিতে কূপবদ্ধ নয়, ভারসাম্যপূর্ণ। আবার সমূহ কল্যাণকর বিবিধ-বৈচিত্র্যসহ কুরআনের তাফসীরও একাধিক নয়। একটাই। অন্তত 'জালিমের তাফসীর' 'মজলুমের তাফসীর' বলে কিছু নেই এখানে। কুরআন অদ্বিতীয় এক সেল্ফ-এক্সপ্লেইন্ড কিতাব। অন্য কিছু দরকার হয় না, সময়ে সময়ে সে নিজেই নিজেকে স্পষ্ট করে তোলে। এবং

তার তাফসীরের ইতিহাস থেকে জালিমের অপব্যখ্যাসমূহ, জালিমের ইন্ধনদাতা অংশটুকু, এমনকি কারো করা অনিচ্ছাকৃত ভুলটুকু পর্যন্ত ছেটে ফেলে দেয়।

অথচ, ফরহাদ ভাই এটাও আমাদেরকে সেই কমিউনিজমের মাধ্যমেই 'দেখাতে চান'! তিনি বলেছেন: 'আজ আমাদের সেই কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে যে কমিউনিজম... দেখাতে চায় কীভাবে ইসলাম যুগে যুগে নিপীড়িতের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে নিজের সংস্কার নিজে করতে সক্ষম হয়েছে...।'

অথচ এটি মোটেই কমিউনিজম কিংবা অন্য কারো দেখানোর বিষয় নয়, বরং ইসলামের একান্ত বিষয়। রাসূলুল্লাহ বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের মধ্য এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের উত্থান ঘটাবেন, যিনি/যারা তাঁর জন্যে তাঁর দীনকে সবল ও সতেজ করবে।'

এখানে কথিত 'সংস্কারের' কোনো ব্যাপার নেই। এবং শুধু এখানে নয়, ইতিহাসের অন্য যে কোনো প্রান্তে যান, দেখবেন— ইসলাম সংস্কৃত হয়ে নয়, বারবার তার আদি বা নির্ভেজাল রূপ নিয়েই ফিরেছে। এটাও এক অদ্ভূদ ব্যাপার। আর সমস্ত কিছুই যুগের পীড়নে যখন বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তাকে ফিরতে হলে নানাদিক হতে যুগের তালে সংস্কৃত হয়েই ফিরতে হয়। আর ইসলাম! সংস্কৃত হয়ে নয়, ফিরে যুগের ময়লা ঝেড়ে। এবং সংস্কৃত হতে হতে ভিন্ন কিছু হয়ে নয়, সেই অকৃত্রিম ইসলাম হয়েই ফিরে। ফিরে সতেজ ও সবল হয়েই। সুতরাং, কমিউনিজমকে কিছুই 'দেখাতে' চাইতে হবে না। সে নিজেকেই নিজে একটু দেখভাল করুক। নিজের চরকায় তেল দিক। তার দিক থেকে সেটাই তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই না?

সুতরাং, কমিউনিজমের চোখে নয়, আমাদেরকে বরং দেখতে হবে ইসলামের চোখেই। এবং যুগের জারিজুরিতে তাড়িত হয়ে নয়, বরং কাঙ্ক্ষিত যুগ বিনির্মাণে। সেই পরীক্ষিত একক, অখণ্ড, অকৃত্রিম ইসলামের কথা বলতে হবে...

১১. শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকীর **"তবু ইসলামের কথাই বলতে হবে... খসড়া-০৪ (শেষাংশ)"** থেকে উদ্ধৃত:

আবার এ কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইসলামের নামে জালিম-মজলুম দ্বন্দ্বের যে বয়ান ফরহাদ মজহার হাজির করেছেন, তার উৎস মোটেই ইসলাম নয়। এটি মূলত কমিউনিজমেরই আরেক রূপ। বুর্জোয়া-প্রলিতারিয়েত শ্রেণিসংগ্রামের অনুবাদ মাত্র।

অর্থাৎ, বুর্জোয়া-সর্বহারার তর্জমা জালিম-মজলুম করে তিনি তা ইসলামের উপর আরোপ করে দিতে চান। কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ার মতো খানিকটা। এর মাধ্যমে সস্তা কিছু রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে আসল কাজ— পুঁজিবাদী দানবীয় সভ্যতার মোকাবিলায় ইসলামের সক্ষমতা যাচাই করে দেখা, কমপক্ষে তাত্ত্বিক জায়গা থেকে। সেই কাজ ইসলামের দিক থেকে ইসলামকে যতদূর সম্ভব ধারণ করেই করতে হবে। কমিউনিজম বা অন্য কারো বিষয়-আশয় ইসলামের উপর আরোপ করে পর্যালোচনার মানে দাঁড়াবে ‘যেই লাউ সেই কদু।’

তাছাড়া কমিউনিজম থেকে আমদানি করা বুর্জোয়া-প্রলিতারিয়েত শ্রেণিসংগ্রামকে ফরহাদ মজহার যেভাবে ‘জালিম-মজলুমের লড়াই’ নাম দিয়ে ইসলামীকরণ করতে চাইছেন, ইসলামে জালিম-মজলুম লড়াই সবসময় সেরকম কোনো বাইনারিতে চলে না। আগেই বলেছি ইসলামে সে লড়াই অনেক বেশি সূক্ষ্ম, গভীরতর এবং ব্যাপক। এমনকী নিজের প্রতি নিজের জুলুমকেও ইসলাম নিন্দা করে, হারাম বলে। অনুতাপযোগ্য ও ক্ষমাপ্রার্থনার বিষয় হিসেবে গণ্য করে, প্রত্যাখ্যানের পথ ও পাথেয় যোগায় (০৭:২৩)। শুধু তাই নয়, নিজের/নিজেদের উপর নিজের/নিজেদের জুলুমও ইসলামে শাস্তিযোগ্য অপরাধ (২২:১০)। এটা কিন্তু ছোটখাটো কোনো ব্যাপার নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে আরো অজস্র বিষয়। গোটা কমিউনিজম তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আপনি কিন্তু এরকম একটা অসাধারণ শক্তিশালী উপাদান পাবেন না, যেটি পুঁজিবাদের প্রতিপক্ষে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

আবার ইসলাম তাদেরকেও জালিম বলে যারা আল্লাহর সাথে অংশীবাদে লিপ্ত হয়। এবং সেটাই হলো জুলমুন আজীম, সর্বোচ্চ জুলুম (৩১: ১৩)। এবং এই শির্কী জুলুমকেই ইসলাম— জলে-স্থলে বিপর্যয়ের মৌলিক কারণ হিসেবেই দেখে (৩০: ৪১)। একইভাবে ইসলাম তাদেরকেও জালিম বলে, যারা আল্লাহর সর্বোত্তম ন্যায্য নির্দেশ মতো ফায়সালা করে না (০৫: ৪৫)। ইসলাম বলে— ‘এবং তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে? (০৬: ২১, ১০: ১৭)

কিন্তু মি. মজহারবৃন্দ যখন জালিম ও জুলুমের এই সামগ্রিক/কম্প্রিহেন্সিভ কনসেপ্ট ধারণ করেন না বা করতে চান না, নিদেনপক্ষে এর কোনো

'রাজনৈতিক' উপযোগিতা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করেন না, তখন এটা ভাবা অন্যায্য নয় যে ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। তখন ইসলামের নামে উনি বা অন্য কেউ যতই 'জালিম-মজলুম' বাতচিৎ করুন সেটা— ঐ যে বললাম কমিউনিজমের বুর্জোয়া-প্রলিতায়েতের পুরোনো প্যাঁচালে পর্যবসিত হওয়া ছাড়া নতুন কোনো পথ থাকে না। অথচ কে না জানে, পুঁজিবাদের সাথে আজকের সংগ্রাম বুর্জোয়া-প্রলিতারিয়েতের খাপে ফেলে মোকাবিলার কোনো পথ নেই।

কমিউনিজমকে টনিক বানিয়ে পরিমাণমত সেবন করে আজকের পুঁজিবাদ অনেক বেশী সফিস্টিকেটেড হয়ে উঠেছে। আরো জটিল প্রক্রিয়ায়, আরো ভয়ংকর দানব হয়ে উঠেছে। সো, যে এন্টিবায়োটিকের সাথে ক্যাপিটালিজমের জীবাণু একবার জিতে গেছে সে এন্টিবায়োটিক আজ অকার্যকর। এখন নতুন সম্ভাবনাকে আমাদের নতুন জায়গা থেকে নতুনভাবে নতুন প্রক্রিয়ায় দেখতে হবে। নতুন করে লালন করতে হবে নতুন স্বপ্ন। উজ্জীবিত হতে হবে নতুন বিশ্বাসে।

০২.

তাহলে সারকথা হলো— ইসলাম কমিউনিজমের তরিকায় জালিম-মজলুম ভেদ করে না। এরচেয়ে ঢের শক্তশালী সুন্নাহ তার আছে! আবার ফরহাদ মজহার সমাজতন্ত্রী কায়দায় জালিম-মজলুমের যে ভেদ-বিভেদ টেনেছেন, তর্কের খাতিরে তা মেনে নিলেও বলা যায়, ইসলামের জালিমবিরোধী মৌলিক প্রকৃতিগত কারণেই জালিমের পক্ষে এখানে কোনো তাফসীর থাকতে পারে না। ইসলাম প্রতিনিয়ত সেসব বর্জ্য সংশ্লিষ্ট জালিমের দিকেই নিক্ষেপ করে।

তবে হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে ইতিহাসে 'একটি পক্ষ আছে জালিম রাজা-বাদশা' জমিদার মুনাফাখোরদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, নানা ছুঁতোয়, নানা মুখোশ পরে। এবং 'হতে পারে' নয়, এটাই সত্য। খিলাফাতে রাশেদার পর থেকে তারাই উম্মাহর আর্থ-রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রসমূহ জবরদখলের ধিকৃত অংশীদার। নিজেদের প্রয়োজনে নানা কূটকৌশলে তারা ইসলামের সংশ্লিষ্ট উপাদানের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা হাজির করেছে। কিন্তু সেরকম নানা অপব্যাখ্যার ইতিহাস নেই কোথায়? বলা যায়, পৃথিবীর কোনো কল্যাণপ্রয়াসী ধর্ম বা মতাদর্শই এই 'ভেতরের পুঁজিবাদী' শয়তানি শক্তিসমূহের অপব্যাখ্যা হতে রেহাই পায়নি। কমিউনিজমও কী পেয়েছে রক্ষা?

ট্রাজেডি হলো— এইসব ধর্ম বা মতাদর্শ, প্রথমত হাজারও অপব্যাখ্যায় পিষ্ট হয়, শেষে সেই অপব্যাখ্যাই তাদের নতুন করে নির্মাণ করে। এবং দেখা যায়, সেই শয়তানি শক্তিই হয়ে উঠেছে তাদের অস্তিত্বের গন্তব্য। বড়ই নিদারুণ সত্য বটে।

কিন্তু এরচেয়ে সুখোষ্ণ সুসংবাদ হলো— মুয়াবিয়ার (দু:খিত, ইতিহাসের প্রয়োজনে মুয়াবিয়াকে আনতে হলো) মতো কূটকৌশলী হোক, এজিদের মতো নরপিশাচ হোক, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো জালিম হোক কিংবা হারুনুর রশিদের মতো মোলায়েম হোক, কেউই ইসলামের অজেয় দুর্গে তাদের কোনো আঁচড় কাটতে পারেনি। তাদের সবই সর্ববৈ ব্যর্থ হয়েছে। তাদের বিপুল সৈন্য-সামন্ত, প্রভাব প্রতিপত্তি, দববারী আলেম কিংবা বুদ্ধি-বিক্রেতা লাঠিয়ালসহ আরো যা যা ছিল, কিছুই তাদের কোনো কাজেই আসেনি। ইসলাম সেই একক, অখণ্ড, অবিকৃতই রয়ে গেছে।

শুধু ইসলামই অমন থাকতে পেরেছে, আর কিছুই নয়। শুধু গলি-ঘুপচি পেরিয়ে খোলামনে তাকে ডেকে নিতে হয়, এই যা। আমাদের পূর্বসূরীগণ— রাসূলুল্লাহর সত্যপন্থী সাহাবী, আহলে বাইতের সংগ্রামী ইমাম ও সদস্যগণ, তাঁদের অকুতোভয় সাথীরা এবং যুগে যুগে মুজতাহিদ-মুজাদ্দিদরা তাঁদের নিরন্তর সাধনা, কলিজার শেষবিন্দু খুন দিয়ে অক্ষত করে রেখেছেন ইসলামের পরশ পাথর। সুতরাং, তাফসীর যতই মানুষ করুক, যে কিতাব জালিমের ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণার উৎস, তার তাফসীর জালিমের পক্ষালম্বন করতে পারে না। কোনটি কুরআনের তাফসীর, কোনটি জালিমের বরকন্দাজ তা একটু বুঝে নিতে হয় মাত্র।

কিন্তু ফরহাদ মজহার কেন অত বুঝতে যাবেন? ইসলামকে দু'ভাগ করে ফেললেই বরং তার সুবিধে। এতসব সত্যোদ্ধারের ঝামেলায় যেতে হয় না। তাফসীরকে 'জালিমের তাফসীর' এবং 'মজলুমের তাফসীর'-এ দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেই আসল তাফসীর পরখ করার পরিশ্রম বেঁচে যায়! তারপর দুটোর মধ্যে তার কমিউনিজমের জন্য যেটি উপাদেয় সেটির যেটুকুন লাগে কেটেকুটে নিয়ে নেবেন, নতুন বয়ানের জন্য এর বেশি আর কী লাগে? তারপর বলে দেবেন— 'তবু কমিউনিজমের কথাই বলতে হবে...'

আসুন ফরহাদ মজহারের সমূহ প্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ সমীহ রেখেই একটু হেসে উঠি। তার থেকে আরো যা কিছু শেখার আছে, সেসবের প্রতি বিরাগ পোষণ না করেই আরো একবার প্রাণ খুলে হেসে উঠলে ক্ষতি নেই। তারপর প্রশ্ন

করুন— ফরহাদ ভাই, যদি জালিম-আশ্রয়ী তাফসীর ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে, যদি মজলুমপক্ষীয় তাফসীরই কুরআন গ্রহণ করে, তখনও কী আপনি তাফসীরের বিবাদ তুলে ইসলাম থেকে সরে আসবেন?

সত্যি বলতে কী, তখন আপনার যতই অপছন্দ হোক, তবু ইসলামের কথাই বলতে হবে...

ফেইসবুকে প্রদত্ত মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Shakhawat Hossain: স্যার, চিন্তার বিশুদ্ধায়ন ঘটানো দরকার, নইলে এরকম ফরহাদ মজহারের খপ্পরে আমাদের ভাইয়েরা আরো পড়বে।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** হ্যাঁ, চিন্তার পরিশুদ্ধি অতি জরুরি। এবং সেটি হতে হবে ইসলামের ভিতর থেকে। অথবা অন্যভাবে বললে, জীবনবোধ হতে প্রত্যক্ষভাবে। পাশ্চাত্যের বরাতে ইসলাম বোঝার চেষ্টাটা স্বয়ং একটা ভুল পদ্ধতি। অন্তত ইসলামের দিকে থেকে। প্রতিটা মানুষই তার জীবন, অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক বুঝজ্ঞান দিয়ে পরম সত্যকে সরাসরি জানতে পারে। এসবের জন্য অতিবড় বুদ্ধিজীবী হওয়া লাগে না।

Syed Khashrul Hasan: ভাই, কিছুই বুঝি নাই। ফরহাদ সাহেবের দোষ খুঁজে পাইনি আমি। আর ইসলাম নিয়ে আমিই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যাদাতা তাও বেঠিক পথ। ধরেন আমরা কি কারো মত দেবার পথকে রুদ্ধ করতে পারি? এই যে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা, এটা কতটা গ্রহণযোগ্য? মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ইসলাম আর সাম্যবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন, একটা মত দাঁড় করিয়েছেন, সেই স্টাডিকে কি ডিলিট করবো? আমি ভয়াবহভাবে ইসলাম ইস্যুতে সিন্ডিকেশন আর রিজার্ভ শিক্ষার ওনারশিপ দেখতে পাই, সেটাও মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ মত বৈকি। ইসলাম অধ্যয়ন এবং মত দেয়া আমার অধিকার। আর তাকে রুদ্ধ করার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেয়নি। সিলসিলার কথা বলে যখন চিন্তাকে রুদ্ধ করা হয় তখন সেটাও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। আজ হাজার হাজার স্কলার মত দিচ্ছেন। তাহলে মজহার সাহেব দিলে দোষ কী? আমি পড়বো, গ্রহণ করবো— এটাও আমার চয়েজ। ধন্যবাদ স্যার, আপনার নিজের কথাটা বলুন। বাছাই করার অযোগ্যতা আমার সমস্যা, আপনার বা মজহার সাহেবের না।

> **Shahadat Mahmud Siddiquee:** ঠিকই বলেছেন ভাই। আপনি আসলে কিছুই বুঝেননি। ফরহাদ সাহেবের দোষ পাবেন কোত্থেকে, দোষ

করলেই তো পাবেন। কেউ কি বলেছে যে উনি দোষ করেছেন? বলেছে, ফরহাদ মজহার যা করেছেন তা করতেই পারেন। আমরা কী বলেছি— "ফরহাদ মজহার যদি 'বদ্ধ, সংকীর্ণ ও ইসলামী আতঙ্কের রুগী হয়ে বাংলাদেশে হাজির' থাকা কমিউনিজমকে নতুন করে নির্মাণ করতে চান, সেজন্য যদি 'কমিউনিজমের দিক থেকে ধর্মকে বিচার করবার সঠিক নীতি ও কৌশল সম্পর্কে' নিরন্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং যদি মনে করেন— 'আমাদের দেশে আগামী দিনে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী আদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হলে ইসলাম প্রশ্নের একটা মীমাংসা দরকার।' এবং কমরেডদের 'এই বাস্তবতাটুকু' মানানোর কায়মনো প্রয়াস চালান যে 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম নিয়ে আলোচনা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নাই।' এবং 'সেই দিক থেকে কমিউনিস্টদের মধ্যে কীভাবে আলোচনা হলে তা সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে সেই দিক নিয়েও' বিস্তর চিন্তা-গবেষণা করেন। তাহলে তাতে কারো কোনো বিশেষ মাথাব্যথার কারণ থাকতে পারে না।"

সমস্যা হলো অন্য জায়গায়— "কিন্তু কেউ যদি 'আধা ইসলাম আধা কমিউনিজমে'র নতুন কোনো দীন-ই-ইলাহী রচনার স্বপ্নে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তাহলে সমূহ মাথাব্যথার অবকাশ আছে বৈ কি!"

"একজন মুসলমান যখন জালিমের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ায়, তখন তার ঈমানী দায়িত্ব থেকেই দাঁড়ায়, মুসলমান হিসেবেই দাঁড়ায়, পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি থেকেই দাঁড়ায়। মায়ের কাছে নানার বাড়ির গল্প বলার মতো এখন কোনো পক্ষ যদি জালিম ও মজলুমের দ্বন্দ্বে এতটাই অনর্থ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন যে তারা আস্তিক-নাস্তিক ভেদ রাখতে চান না, বলেন 'পরকালের কথা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই বরং মুমিনের কাজ।' তাছাড়া 'পরকালের কথা তো আমরা ইহকালেই বলি।' সুতরাং, ইহকাল-পরকালের ব্যাপার একপাশে রেখে 'রাজনীতিটা' ঠিক করো। বাক্যের মারপ্যাঁচে চট করে ধরা না গেলেও, এ ধরনের কথা যারা বলেন, প্রকারান্তরে তারা ইসলামের ভিত্তিমূলেই আঘাত করেন। তাওহীদ-রিসালাত-আখিরাতের ভিত্তিভূমি থেকে মুসলমানদের ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের করে নিতে চায়।"

এটাও ফরহাদ মজহারের সমস্যা নয়, একজন কমিউনিস্ট হিসেবে তিনি

তাও করতে পারেন। তাওহীদ-রিসালাত-আখিরাতের ভিত্তিভূমি থেকে কাউকে বের করে নেয়ার চেষ্টা করতেই পারেন। একইভাবে ঈমানদারদের সতর্ক করার কাজও অন্য কোনো পক্ষ করতেই পারে। কে কাকে কেন গ্রহণ করবে বা করবে না, সেটা একান্ত তার ব্যাপার। সমস্যা হলো ফরহাদ মজহার ইসলামকে দেখছেন কমিউনিজমের জায়গা থেকে, ক্ষেত্রবিশেষে কমিউনিজম ব্যাপারটি মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য করার কৌশল হিসেবে জালিম-মজলুমের দ্বন্দ্ব হিসেবে হাজির করছেন। অথচ আমরা বলছি তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

যে কোনো মতাদর্শেরই ব্যাখ্যা হবে সে মতাদর্শের ভেতরে থেকে, তার মূলনীতির সীমানায় অবস্থান করেই। মূলনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাখ্যা করলে সেটা ব্যাখ্যা হয় না, সেটা হয় নতুন কিছু একটা। মেনডেলের জীনতত্ত্বের ক্রসিংয়ের মতো খানিকটা। তাছাড়া বাইরে থেকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য হতে পারে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শটি হতে নিছক জ্ঞানতাত্ত্বিক/বুদ্ধিবৃত্তিক ফায়দা হাসিল, অথবা মতাদর্শটি মোকাবিলার প্রয়োজনে, অথবা দুটোই উদ্দেশ্য হতে পারে।

সুতরাং, ব্যাখ্যা যে কেউই করতে পারেন। কিন্তু মুসলমানদের জন্য সেটি অবশ্যই ভেতর থেকে হতে হবে, ইসলামকে own করেই হতে হবে এবং অবশ্যই অপরিবর্তনীয় মূলনীতির সীমা অতিক্রম না করেই হতে হবে। আর বাইরের কেউও ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু সেটা তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার প্রয়োজনেই করা। ইসলামের জন্যও নয়, ইসলামের প্রয়োজনেও নয়। ধন্যবাদ তবে।

Syed Khashrul Hasan: ঔন না করেও ব্যাখ্যা হতে পারে।

Shahadat Mahmud Siddiquee: ঔন না করে হওয়া মানে কী? তারমানে আপনি প্রতিশ্রুত নন। আমি এমন কারো কথা বা ব্যাখ্যা কেন শুনবো, যা তিনি ঔন করেন না? কুরআন বলেছে— তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা ঔন করো না? অর্থাৎ, যা মানো না। ইসলামের ইতিহাস কী বলে? একটি হাদীস গ্রহণ করার জন্য হাদীসবেত্তারা বর্ণনাকারীর গোটা জীবন বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু ঔন করা নয়, তার জীবনে আল্লাহভীতির গভীরতা পরিমাপ করার মতো জটিল ও কঠিন কাজটি করতেও আলস্য করেননি। আর আপনি কিনা এমন কারো কথা অনায়াসে মেনে নেবেন,

যিনি সেই কথা বা ব্যাখ্যার উৎস ঔন করেন না! নিতে পারেন, যদি ব্যাপারটি আপনার কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে না হয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ, যার যার কথা তিনি বলবেন। যে বা যারা শোনা ও মানার জন্য উপযুক্ত মনে করবেন, তারা শুনবেন, মানবেন। তাতে আমার না করার কী আছে? আমি তো কাউকে মজহার পাঠে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করছি না। জনাব মজহারের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। উনার সম্ভবত প্রতিটা লেখার নিয়মিত সংগ্রাহকও বটে।

নোটের শিরোনামে যেমনটা বলেছি, আমার খুব অবাক লাগে ইসলামিস্টরা কীভাবে এ রকম একজন স্বঘোষিত মার্ক্সসিস্ট-কম্যুনিস্টকে ইসলামিস্ট মনে করেন...!!!?? মজহার সাহেবের দিক থেকে নিজের অবস্থানের ব্যাপারে তিনি কন্সিসটেন্ট। সব কিছুর পরেও তিনি শেষ পর্যন্ত নোট লিখেন, "তবুও কমিউনিজমের কথাই বলবো।" তো বলেন। সমস্যা কী?

সমস্যা হলো যারা কমিউনিজম ও ইসলামকে এক করে দেখেন, তাদের কাণ্ডজ্ঞানের সমস্যা। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি হলো যাকাত। অথচ কমিউনিজমের অন্যতম মূল কথা হলো ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তি। ঈমানের যে ছয়টি মূল বিষয় অবশ্যস্বীকার্য, তা সাম্যবাদে denied or considered as irrelevant or additional. Am I wrong on this?

হ্যাঁ, Syed Khashrul Hasan ভাই, আপনি ফরহাদ সাহেবের দোষ খুঁজে পান নাই। তাতে আমি অবাক হই নাই। কেন অবাক হই নাই, তা আর নাইবা বললাম। থাক ওসব। ভালো থাকেন।

Syed Khashrul Hasan: দোষ খুঁজে পাইনি মানে তার প্রক্রিয়ার, কাজের। সেটা তিনি করতেই পারেন। আর পারেন বলেই তার দোষ নাই। কিন্তু অনেকেই স্বীকারই করেন না যে তার বলার এবং করার অধিকার আছে। আমি ঠিক এটাই মিন করেছি স্যার। ভাল থাকবেন স্যার।

Masuk Pathan: মার্ক্সের কমিউনিস্ট মেনোফেস্টো আবার পড়েছি। চিরন্তন এক দুঃখবাদ নিয়ে এই প্রগতিটা মাথা ঠুকে মরছে। দুনিয়ার কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না গোষ্ঠীটা! কখনও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে, প্রলেতারিয়েতদের পক্ষে। কখনও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, এমনকি প্রলেতারিয়েত যখন কিছু পুঁজির মুখ দেখে তখন তাদেরকে বুর্জোয়া খেতাব দিয়ে তাদের বিরোধিতা করে। হয়ত

বলবে, যখন যে মজলুম হবে তাদের পাশেই তো বিপ্লবী কমিউন তৈরি করে পাশে দাঁড়াবো!

পুঁজি দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে। এটাও হয়তো খারাপ হতো না, কেননা পুঁজির তো সুষম বন্টন দরকার। মানুষের কাছে পুঁজি দেখলে বেজায় মন খারাপ, অনাস্থা, বিপ্লব হতে হবে। তো মানুষ কেন মুষ্টিমেয় পলিটব্যুরোর সদস্যকে জনপদ/রাষ্ট্রের সকল সম্পদ পুঞ্জিভূত রেখে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতে যাবে! শুধু কিছু পর্যবেক্ষণেরর নমুনা দেখা যায় সেখানে। মুক্তির কোনো বাস্তবসম্মত, আশাদায়ক টিপস কমিউনিস্টদের নেই।

মজহার ভাই মার্ক্সকে এত ভালোবাসেন যে হেগেল, ফয়েরবাখ, এঙ্গেলকে দোষারোপ করলেও কখনও মার্ক্সকে ফুলের টোকাটা দিতেও কষ্ট পান! মজহার ভাই মুসলিম কার্ডটা তাদের বিপ্লবের দিকে ব্যবহারের চেষ্টা হয়তো করবেন। কিন্তু মার্ক্স অর্থনীতির কঠিন চাল দিয়ে মানবতার জন্য আদর্শ বানানোর সময়ে ইসলামকে জানার সময় পাননি। তার সমাজ, ধর্মের মানুষকে যেচেই সকল ধর্মের সাধারণীকরণ করে ফেলেছেন।

হয়তো মার্ক্স মহৎ উদ্দ্যেশ্যে উৎপাদনকেন্দ্রিক অর্থনীতির সূত্রেই জগতের মহা আয়োজন মাপতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া একজন মানুষ এরচেয়ে বেশি আর কীইবা করবেন, যদি তিনি বা তারা মহান স্রষ্টার প্রভুত্ব না মানতে পারেন।

কমিউনিস্ট মেনোফেস্টো যে ম্যাকানিজমে চলে, যে বাস্তবতায়, সেখানে সামনের পিরিয়ডটা হলো কমিউনিস্টদের জন্য বিপ্লবী উদ্যোগ নেয়ার! এবং সব বামপন্থী জানবাজি রেখে বিভিন্ন সুরতে তাই করে যাচ্ছেন। মজহার ভাই হয়তো কোনো একটা রোল প্লে করতে চাইলে চাইতেও পারেন।

তবে মজহার ভাই ইসলাম ইস্যুটাকে নিয়ে ঘেঁটে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে যদি সত্যিই মানবতার মুক্তির সনদ কুরআনের সুশোভিত ছায়াতলে ভিড়তে পারেন মুত্তাকি হয়ে, সেটা হবে সুখবর। সে দোয়া আমাদের কথা উচিত।

Mohammad Al-Amin: ফরহাদ মজহারের বক্তব্য নিয়ে যখন বিচলিত হন, তখন মনে হয় আপনি খুব ইনফেরিয়র কমপ্লেক্সিটিতে ভুগছেন। এটা হয়। কারণ, আপনি তার মতো করে বলতে পারেন না, লিখতে পারেন না, বুঝাতেও পারেন না (যা আপনার লেখায় ফুটে উঠেছে)। কেউ যখন আপনার কথা শুনছে

না তখনই এ ধরনের ফেনোমেনা জন্মায়। ফরহাদ মজহার কিন্তু আপনাকে গুনায় ধরে না, কিন্তু আপনি তারে গুনেন। এটাই ফরহাদ মজহারের বিশেষত্ব, আপনার দুর্বলতা। আপনার নিজস্ব কথা না বইলা যখন ফরহাদ মজহারের লেখা নিয়ে ক্রিটিসাইজ করেন তখন আপনি কিন্তু 'আপনি' থাকেন না, ফরহাদ মজহারের ক্রিটিক হয়ে যান। নিজের অজান্তেই তখন আপনি ফরহাদ মজহারের চাইতে ছোট হয়ে যান। আমি অন্তত এইটা আপনার কাছে আশা করি না। আপনার নিজের কথা বলুন। নিজস্ব আইডিয়া প্রপোজ করুণ। মানুষই যাচাই করবে কে ভুল আর কে সঠিক। সরি, অনেক কঠিন ভাষায় আমার ব্যক্তিগত মতামত দিলাম। কষ্ট নিবেন না। আমি আপনার লেখার একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি ফরহাদ মজহারকেও পড়ি।

Mazharul Islam Khondokar: উনি যদি উনার দৃষ্টিতে কাউকে বিপথগামী মনে করেন, সেক্ষেত্রে সাবধান করার জন্য ক্রিটিসাইজ করতে পারেন। ইসলামিস্টদের জ্ঞানগরিমা কম, পড়ালেখা কম। এ কারণে কারও মিষ্টি কথায় ভুল পথে যেতে পারে। তবে ফরহাদ মজহার আগাগোড়া কমিউনিস্ট, তাকে কবি আল মাহমুদ মনে করা ভুল।

Mohammad Al-Amin: আমার ধারণা, ফরহাদ মজহারকে কেউ ইসলামিক স্কলার মনে করে না, আবার তিনি নিজেকেও ইসলামিক স্কলার বলে দাবি করেন না। তাহলে শুধু শুধু আমরা কেন প্যাঁচ লাগাবো? দেশে কী ইসলামিক স্কলারের অভাব পড়ছে? তার কথা যদি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে তুড়ি মেরে ফেল দিব, সমস্যা কী? ফরহাদ মজহারকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করা মানেই আপনি তারে বড় বানাইতেছেন। ইসলামিক স্কলার বানাইতাছেন। নিজের অজান্তেই।

Syed Khashrul Hasan: মজহার সাহেব একটা অবস্থান নিচ্ছেন। তিনি ইসলামকে দেখছেন আবশ্যিক সত্য হিসাবে বাংলার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গঠনে। তার স্পষ্ট মত হলো— দেশের ৯০ ভাগ মানুষের ভাষা, জীবনাচরণ ছাড়া দেশের সংস্কৃতি আর রাজনীতি গড়ে উঠতে পারে না। তিনি নিজেকে একজন মার্ক্সবাদী বলেন সেক্ষেত্রে মার্ক্স অধ্যয়ন, সেক্যুলারিজম এবং ধর্মের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা পেশ করে কমিউনিজমকেই প্রাণ দিয়েছেন। তার এই পাঠ চায়না বা রাশিয়াতেও নাই। আবার লালন, চৈতন্য আর বাংলা নিয়েও নতুন পাঠ দিচ্ছেন। তার

নিজস্ব বয়ানে জালিম আর মজলুমের সংগ্রামকে মুখ্য করে তোলা হয়েছে, যা আবার মার্ক্সের শোষক-শোষিতের পাঠেরই প্রতিধ্বনি। সর্বক্ষেত্রে কলোনিয়ালিজমের ধারণা প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ওরিয়েন্টালিজমের প্রবল সুর বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দর্শনকেই অনেক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করে। এই সামগ্রিক কাজ বা তার দেয়া দর্শন পিউর ইসলামিস্ট, মার্ক্সবাদী, ডেমোক্র্যাটিক, বাঙালী জাতীয়তাবাদী অনেক ক্ল্যাসিককেই চ্যালেঞ্জ করছে। সুতরাং, মজহার সাহেবের কৃটিসিজম অনেক গভীর থেকেই করতে হবে। আবার কৃটিসিজম না করে বরং নিজের বয়ানটা দেয়াই আরেক স্কলারের কাজ হওয়া উচিৎ। সলিমুল্লাহ খান মজহার সাহেবের কৃটিসিজম করতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে গেছেন বুদ্ধিবৃত্তিকতা থেকে। সুতরাং, চিন্তার সুযোগ আছে

Shahadat Mahmud Siddiquee: ফরহাদ মজহারের বক্তব্য নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নাই। ইনফেরিয়র কমপ্লেক্সিটিতে ভোগারও কিছু নাই। তার মতো করে বলতে, লিখতে, বুঝাতেও পারারও দরকার নেই। সে প্রশ্ন আল্লাহ আমাকে করবেন না। আমার যোগ্যতানুসারে আমি সত্যের পক্ষে ও মিথ্যার প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছি কিনা সেটাই আমার দায়, আপনার দায়, স্যারেরও দায় সেটাই! কার কথা কে শুনছে, কে শুনছে না সেটাও বড় কথা নয়। ফরহাদ মজহারের সমূহ বিশেষত্ব থাকতে পারে এবং আমার-আপনার-স্যারের সমূহ দুর্বলতা থাকতে পারে। আলোচনা বিশেষত্ব ও দুর্বলতা বিষয়ক নয়। কে কাকে গুনলো কি গুনলো না, তাও নয়। আপনার সম্ভবত জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের বিবর্তন ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা নেই, ওটা কোনো ব্যাপার না। তা এই সমস্তরই বিকাশ কিন্তু এই ক্রিটিকের ভেতর দিয়েই। স্বয়ং কমিউনিজমও একটা ক্রিটিসিজম মাত্র, অনেকেই বলেছেন, আপনিও হয়তো জানেন তা। কার্ল মার্ক্সের উদ্ভবও সেই ক্রিটিসিজমের বন-বাঁদাড়ে। ফরহাদ মজহারের মতো হওয়া কিংবা তার চেয়ে বড় হওয়া ঈমানদারের লক্ষ্য হতে পারে না। ইসলাম চায় প্রত্যেক মানুষ মানুষের মতো অনন্য হয়ে উঠবে। মানুষ হয়ে উঠতে দার্শনিক কিংবা জ্ঞানের জাহাজ হয়ে উঠতে হয় না— এ কথা নিশ্চয়ই মানবেন। যাই হোক, বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা অতিক্রম করে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বে আপনার কমেন্ট আক্রান্ত। এজন্যই স্যার হয়তো রিপ্লাই দেননি। স্যারকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকেও।

Masuk Pathan: আলামিন সাহেব, আপনার লাফটাও কিন্তু কুয়ার উচ্চতার সমমানেরই হোল। আপনিও সমালোচনাটা করলেন একটা স্টেরিওটাইপ মাথায় নিয়েই।

আপনিও বুঝতে পারছেন না, যখন একটা সমাজে একটি ক্রান্তিকালে তরুণরা বিশেষ করে নতুন ধাঁচে সংকট মোকাবিলায় কোনো ভাবাদর্শ নিয়ে ভাবতে থাকে এবং জ্ঞানীদেরকে সরল প্রাণে নিজেদের ছায়া প্রদানকারী ভেবে কাছে ভিড়ে, তখন প্রাজ্ঞগণ যদি মজহার ভাইয়ের মতো দর্শনের প্যাচে আশায় গুঁড়েবালি দেয়ার চেষ্টা করেন, তখন জনাব মোজাম্মেল হকের মতো প্রজ্ঞাবানদের দায়িত্ব হয়ে যায় তরুণদেরকে সজাগ করে দিতে।

তবে হ্যাঁ। হেগেল যেভাবে একটি সমাজে খ্রিষ্টবাদকে স্বাভাবিক করে তুলেছেন, করে দিয়েছেন মানুষের মজ্জাগত; মজহার ভাই সেসবের জন্য যদি সংগ্রাম করেন, এ জনপদের অধিকাংশ মানুষের শেঁকড়, বিশ্বাসকে ঔন করে যদি প্রকৃত ভালোবেসে সমাজটা বদলে দেয়ার কৌণিক চূড়ার নেতা হতে পারেন; তবে এটা সবার আগে মোজাম্মেল স্যারদের সুখের বিষয় হবে।

না বোঝে দোষারোপ করবেন না। ভালো থাকবেন।

Mohammad Al-Amin: Masuk Pathan ভাই, আমার কমেন্ট প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য ধন্যবাদ।

Mohammad Al-Amin: Shahadat Mahmud Siddiquee ভাই, আমি মনে করি না যে মোজাম্মেল স্যার আমার কমেন্ট পড়েন নাই। তিনি পড়েছেন, চিন্তা করেছেন এবং সম্ভবত আমার ক্রিটিসিজম মেনেও নিয়েছেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো আপনারা। কত কষ্ট কইরা আমার কমেন্টকে প্রাসঙ্গিক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কইরা তুলছেন। আই লাভ ইট। স্যার যদি আমার কমেন্টকে আপত্তিজনক মনে করতেন তাহলে হয়তো ডিলিট করতেন অথবা আমাকে বলতেন। তা যেহেতু করেন নাই, অতএব ধরে নেয়া যায় যে আমার বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা আছে। গুণীদেরকে সমালোচনা সহ্য করবার ক্ষমতা রাখতে হয়। আমি স্যারকে গুণী মনে করি। তাঁর ভেতর প্রতিভা আছে, কিন্তু কেন সেই প্রতিভা ফরহাদ

মজহারের পিছনে ব্যয় করছেন, সেটাই আমাকে অবাক করে!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: মজহার সাহেবের কথাবার্তার তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে এতগুলো মৌলিক লেখার লিংক দিলাম তারপরেও যদি শুধুই সমালোচনা করার অভিযোগ তোলেন, তাহলে কী আর করা! আপনি বলেছেন, আপনি আমার লেখা পড়েন। তাহলে তো আপনার জানা থাকার কথা আমি মৌলিক লেখা ও সমালোচনামূলক লেখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলি।

যদি আপনি মনে করেন— এক সময়ে আমিও এমনটা মনে করতাম— কারো সমালোচনা না করে শুধুমাত্র ইতিবাচক কথাবার্তা দিয়ে নতুন একটা ধারা তৈরি করার চেষ্টা করাই উত্তম, তাহলে আপনি ভুল করছেন। এটি সরল কিন্তু অবাস্তব চিন্তা।

প্রতিষ্ঠিত ধারা বা চিন্তার সাথে আপনার চিন্তার ফারাক ও এর বিশেষত্বকে ক্লিয়ার না করে নতুন কিছু করা বা গড়ে উঠা তথা কায়েম হওয়া, অংকের নিয়মেই অসম্ভব।

আমার এই লেখার উদ্দীষ্ট পাঠক ফরহাদ মজহার বা উনার পক্ষের লোকেরা নয়। যারা আমাকে নানা বিষয়ে সমর্থন করেন, তাদের কাউকে কাউকে ক্ষেত্রবিশেষে মজহার অনুসারী হিসাবে দেখা যায়। তারা এবং যারা এসব প্যাঁচের মধ্যে এখনো পড়ে নাই সেসব ইনোসেন্টদের জন্য এই লেখা।

অশ্লীল গালি ছাড়া আমি জীবনে কারো কোনো কমেন্ট ডিলিট করি নাই। গত সাত বছরের ব্লগিংয়ে আমি দাবি করে বলতে পারি, এটি মেইনটেইন করেছি। অবশ্য কোনো কমেন্ট যদি দ্বিরুক্তিমূলক অর্থাৎ রিপিটেশান হয় তখন তা ডিলিট করেছি। কিংবা কোনো পরামর্শ দেয়া হলে সেটি যদি আমি মেনে নিয়ে লেখাকে সংশোধন করে থাকি, তখন উক্ত পরামর্শ বা সংশোধনীমূলক কমেন্ট ডিলিট করেছি। এটি আমার জানা মতে বছর দুয়েক আগে কোনো একটা পোস্টে একবার মাত্র হয়েছে। আমি মতামত গঠনের জন্য লেখালেখি করি। শো-অফ বা আমিত্ব জাহির করার জন্য ব্লগিং করি না। ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকেন।

Syed Khashrul Hasan: কিছু বা অংশত গ্রহণ করার ভিতর দোষের

নাই। তার নয়াকৃষির বড় অংশই গ্রহণ করার মতো। জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবশ্যই মানবিক দায়িত্ব। ভাষার গঠনশৈলী দারুণভাবে অনুসরণযোগ্য। ইনসাফ, ইজ্জত আর সাম্যের পক্ষে অবস্থান নেয়াও আমাদের চেতনার অংশ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: রিপন ভাইয়ের মন্তব্যে এ বিষয়ে এইমাত্র একটা রেসপন্স দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি মনে করি আমি বা যে কারো জন্য তিনি একজন ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। এই বয়সে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কারো কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার মানে তিনি অল ব্যাড এমন নয়। আমি কাউকে ভিলিনাইজ বা গ্লোরিফাই করার কাজে বরাবরই অনাগ্রহী।

Mohammad Al-Amin: ধন্যবাদ স্যার, সুন্দর কমেন্টের জন্য।

Sheikhul Ripon: একজন কৃষিবিদ হিসেবে ফরহাদ মজহারের তুলনা মেলা ভার। সবকিছুর উর্ধ্বে দেশ মাতৃকার সেবায় তাঁর এ অবদান অনস্বীকার্য। এখানে আশা করি কোনো দ্বিমত নেই।

Shahadat Mahmud Siddiquee: কৃষিতে আছে, রাজনীতিতে আছে, দর্শনে আছে, লালনবাদে আছে, বুদ্ধিবৃত্তিতে আছে, কবিতায় আছে। হয়তো আমাদের না জানা আরো অনেক বিষয়ে আছে তার অবদান। সেটা কেউ অস্বীকার করছে না, আলোচনায় বিষয়বস্তুও সেটা নয়। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ফরহাদ মজহার একজন অনুসরণীয় ব্যক্তি। অন্তত আমার কাছে। যেমন করে সলিমুল্লাহ খান, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মোহাম্মদ ইউনুস, আনু মোহাম্মদ ও জাফর ইকবালের মতো লোকেরা আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁরা প্রতিভাবান। স্বীয় আদর্শের জন্য নিবেদিত। তাঁদের মতো টাওয়ারিং ফিগারদের কাছ হতে অনেক কিছু শিখার আছে।

ইসলামপন্থীদের মধ্যে যারা মজহারকে মার্ক্সসিস্ট-কম্যুনিস্ট জেনেও তার কাছে যান, তাকে সমর্থন করেন, তারা এই ক্যাটাগরির উপরোল্লেখিত কয়েকজনসহ এ ধরনের আরো যারা আছে তাদের কথা তো কখনো বলেন না...! তাদের কাছে যান না। অন্তত দেখি না। কেন? মনে হয়, এখানে একটা গোলমাল আছে। সেটা পরিষ্কার করার জন্য এই নোট লেখা।

যে কোনো আদর্শের সুস্থ্য পরিপুষ্টির জন্য ভিন্ন ও বিপরীত আদর্শের ভালো ভালো জিনিসগুলো গ্রহণ করে নেয়া ভালো। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো যতক্ষণ আপন-পর ভেদাভেদটা ক্লিয়ার থাকে। সত্য-মিথ্যার মিক্সড-আপ পরিস্থিতিতে অনুরূপ ধরনের কিছুকে এভয়েড করা, ক্ষেত্রবিশেষে অপোজ করা জরুরি। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক হযরত উমরকে (রা.) তাওরাত-ইঞ্জীল পড়তে বারণ করার এটিই কারণ।

আপনি এসব জানেন, বুঝেন। সেটি আমি জানি। বাদবাকি পাঠকদের জন্য আমার এই ক্লারিফিকেশান।

Shekh Alamgir: ফজরের আজানের সময় তার 'গোষ্ঠ' গান করা নিয়ে তাকে আমি একবার বিভ্রান্ত মানুষ বলেছিলাম। ফরহাদ মজহার আমাকে গালি দিয়েছিলেন। তারপরও এখন পর্যন্ত তার লেখায় এমন ইতরবিশেষ কিছু খুঁজে পাইনি যে তাকে পড়েই যাবো। তবে তার মতামতের জন্যে তাকে কখনও অসম্মান করতে চাই না।

Ahmad Musaffa: সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি যে লালনবাদকেও প্রমোট করতে চায়, তার পক্ষে পূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করা কীভাবে সম্ভব আমার বুঝে আসে না।

নবুয়তকেন্দ্রিক সভ্যতার ধারণা প্রসঙ্গে মজহারীয় রাষ্ট্রচিন্তার অসঙ্গতি পর্যালোচনা

গতকাল জনাব ফরহাদ মজহার উনার চিন্তা পাঠচক্রে থমাস হবসের ‘লেভিয়াথান’ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ নিয়ে আজ সকালে তিনি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তাতে উনি হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদকে ভুল হিসাবে চিহ্নিত করে, উনার মতে, এরই ওপর ভর করে গড়ে উঠা আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে, যারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাচ্ছে তাদেরও তিনি সমালোচনা করেছেন। উনার ভাষায়, “ইসলামপন্থিরা যখন কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক রাষ্ট্রের গায়ে ইসলামি জোব্বা পরিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র দাবি করে, তারা তখন মানুষের চরিত্র ও সমাজ সম্পর্কে হবসের অনুমানকেই মেনে নেন।”

আমি উনার বক্তব্যের বিরোধিতা করা ওয়াজিব মনে করেছি। উচিত ছিলো, এ নিয়ে প্রবন্ধাকারে কিছু লেখা। সময়, পরিবেশ ও আলসেমির জন্য তা না করে আমি ৩৮ মিনিটের একটি ভিডিও বক্তব্যটি তৈরি করেছি: https://youtu.be/r8GP-hYtq1c

এতে আমি বলেছি, ইউরোপীয় রাষ্ট্রদর্শনে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রধানত তিনটি। হবসের সামাজিক চুক্তির প্রস্তাবনার সাথে জন লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রস্তাবনা সামঞ্জস্যশীল নয়। যদিও পরিণতির দিক থেকে তারা মোটাদাগে একই। অর্থাৎ তারা সবাই-ই রাষ্ট্র গঠনের পিছনে সামাজিক চুক্তির অপরিহার্য ভূমিকার কথা বলেছেন। আধুনিক রাষ্ট্র গঠনটা ভুল ছিলো, এ কথা তারা কেউ বলেন নাই।

সামাজিক চুক্তির মতবাদগুলোকে একসাথে অধ্যয়ন না করে এর একটাকে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন ও ‘পর্যালোচনা’ করা মতলবি বুদ্ধিজীবিতার পরিচায়ক।

মজহার ঠিক এই কাজটিই করেছেন। উনার লক্ষ্য হলো, উনার আরাধ্য ‘শ্রেণিহীন সমাজের’ পক্ষে ওকালতি করা। যে ধরনের ইউটোপিয়ান সমাজে, উনাদের কষ্টকল্পনা মোতাবেক, রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটাই থাকবে না।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বার বার ‘সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের’ কথা বলেছেন। আমরা জানি। শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতিরেকে ‘সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ’ অসম্ভব। আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন, “তোমরা মন্দ কাজকে হাত দিয়ে বাধা দাও। না পারলে প্রতিবাদ করো। তা না পারলে সেটাকে ঘৃণা করো।” আমরা জানি, যাকাত থাকা মানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থাকা। শ্রেণিহীন সমাজে যাকাত নামক ইবাদত থাকার প্রশ্ন উঠে না। আমরা জানি, যাকাত একটা ত্রিপাক্ষিক ব্যাপার: (১) দাতা, (২) আদায়কারী কর্তৃপক্ষ ও (৩) গ্রহীতা। তো, এই আদায়কারী কর্তৃপক্ষকে নিয়োগ দিবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের তরফে ক্ষমতাসীন সরকার। জুমা ও ঈদের নামাজে এবং হজ্বের সময়ে আরাফাতের ময়দানে খুতবা দিবে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি। জিহাদ ঘোষণা ও পরিচালনা করবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। ইসলামে ধর্ম ও শাসনক্ষমতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটি অচল ও অকার্যকর।

শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়া ইসলাম ‘ধর্ম’ পালন করা অসম্ভব। ইসলাম অবশ্য অগত্যা পরিস্থিতিতে মানুষকে প্রয়োজনীয় ছাড় দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকা বা ন্যূনতম মানে না থাকা সত্ত্বেও এই রুখসত বা ছাড়ের কারণে মানুষ দুর্বল মানে হলেও মুসলমান হিসাবে জীবনযাপন করতে পারে।

ইসলামের গোড়া কেটে, ইসলামকে ইসলাম যেভাবে চায় সেভাবে গ্রহণ না করে, একে প্রকারান্তরে ডিজওঁন করে মজহারের মতো সুচতুর ব্যক্তি অবুঝ ইসলামপন্থীদের কাছে নিজেকে ইসলামদরদী বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থাপন করে। নিজেদের মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা না থাকা ও হীনমন্যতার কারণে কিছু অবুঝ ইসলামপন্থী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের মতো ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীদেরকে দৃশ্যত ভালো জানেন, একই সাথে আবার কথায় কথায় ‘ফরহাদ ভাই’ বলে নিজেদের মজহারী হিসাবে পরিচয় দিতেও প্রীতবোধ করেন। কী পিকিউলিয়ার তাদের মেন্টালিটি!

কম্যুনিজম জানতে চান? ভালো কথা। দুনিয়াজোড়া বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত এই মতবাদ বাংলাদেশে ডমিন্যান্ট ইন্টেলেকচুয়্যাল ট্রেন্ড। অতএব, এ সম্বন্ধে জানাশোনা থাকাটা জরুরি। তো, ইসলামিস্ট ভাইবেরাদরগণ, বাংলাদেশে

মজহারের মানের কম্যুনিস্ট তো আরো অনেকেই আছেন। তাদের ডেরায় আপনাদের আনাগোনা দেখি না কেন? কারণ, আপনাদেরকে খুশি করার জন্য কী কী বলা ও করা দরকার, মজহার তা জানেন। তাই তো উনাকে আপনারা খুব ভালো পান।

আপনাদের পত্রিকা ও প্লাটফরমে উনাকে 'সহজিয়া-সাম্যবাদী-ইসলাম' নামক অনৈসলামী মতবাদ ফেরি করার সুযোগ দেন। উনার 'তবুও কম্যুনিজমের কথাই বলতে হবে'-তে আপনারা আনকমফোর্ট ফিল করেন না। কিন্তু উনি যখন উনার কোনো একজন সেবাদাসীর সাথে যৌন সম্পর্ক করেন, এবং এ নিয়ে উনার 'স্ত্রী'র সাথে নাটক করতে গিয়ে যখন মিডিয়া সেনসেশনের কবলে পড়েন, সেটি তখন আপনাদের খুব খারাপ লাগে। 'এসব কিছু' জানাজানি হওয়ার পরে উনাকে আর আপন মনে করেন না। 'ব্যভিচারী' হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এতো অবুঝ আপনারা!

নেট কানেকশনের সমস্যার কারণে অনেকে আমার ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে দেখতে পারেন না। তাদের জন্য এবং মজহার সমর্থক ইসলামপন্থী হিসাবে আপনার চিন্তার অসঙ্গতির জায়গাটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্য, আপনাদের বোধেদয়ের জন্য এই ছাঁচাছোলা কথাগুলো এভাবে বলা। আমার পক্ষ থেকে যে ধরনের ভাষা আপনারা মোটেও আশা করেন না, সে ধরনের ভাষা কিছুটা এসে পড়েছে। আই এম সরি ফর দ্যাট!

মজহারপন্থী ইসলামিস্টরা চিন্তার সংকটে ভুগছেন। মজহারের চৌদ্দ পৃষ্ঠা পড়তে তারা ক্লান্ত হন না। কিন্তু কারো কারো কাছে, 'নিজেদের লোক' মোজাম্মেল স্যারের তিন-চার পৃষ্ঠা লেখা পড়তেও কষ্ট লাগে। মজহারের বাগাড়ম্বরসর্বস্ব, সারবত্তাহীন ও বৈপরীত্যপূর্ণ লেখাগুলো তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হয় না। শুধু মোজাম্মেল স্যারের লেখাগুলো তাদের কাছে কঠিন ও দুর্বোধ্য ঠেকে। আসলে তারা 'নিজেদের' কাউকে সেই মানের বুদ্ধিজীবী বলে মনে করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নন। এখনকার ইসলামপন্থীদের একটা বিরাট অংশের ধারণা, বুদ্ধিজীবী হতে হলে যেন অন্তত খানিকটা হলেও বামপন্থী হতে হবে। আমি জানি, বামপন্থীরা কতটা শ্রুড প্রকৃতির। আপনাদের অনেকের চেয়ে আমি তাদের বেশি চিনি। বামপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য খানিকটা মন্দের ভালো বা তুলনামূলকভাবে ভালো। বাট আল্টিমেইটলি, অল দ্যা বার্ডস আর উইথ দ্যা সেইম ফেদার। এট দ্যা এন্ড অব দ্যা ডে, দে আর ইনহারেন্টলি

ইসলামোফোব-রেডিক্যাল-ফেনাটিক এথিইস্ট। তাদের মধ্যে যারা মজহারের মতো চতুর তারা ইসলামপন্থীদের ব্যবহার করতে চায়। মজহারের ভাষায়, এটি বুর্জোয়াতন্ত্র হতে সাম্যবাদের পথে 'গণতান্ত্রিক রূপান্তরের' ফর্মুলা।

'সামাজিক আন্দোলন' ইউটিউব চ্যানেলে আপ করা আমার এই ভিডিও বক্তব্যটির ডেসক্রিপশনে ফরহাদ মজহারের পুরো স্ট্যাটাসটি উদ্ধৃত করা আছে।

ফেইসবুকে প্রদত্ত মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Arman Alauddin: ইসলামপন্থীদের এই আচরণ শুধু ফরহাদ মজহারের ব্যাপারেই নয়, অন্যদের ব্যাপারেও দেখা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন তারা এক একটি দলকে আপন মনে করে পরবর্তীতে সেই দলটিই তাদেরকে আবর্জনার মতো দূরে ছুঁড়ে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও তেমনটিই দেখা যায়। যেমন আল মাহমুদের ক্ষেত্রে। ইসলামপন্থী হিসাবে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার অশ্লীল ও নোংরামিপূর্ণ লেখাগুলো নিজেদের কর্মীদেরকে পড়তে উৎসাহ জুগিয়েছে।

Jubaer Talha: ভালোই বলেছেন স্যার। সব দিক থেকে আপনার সাথে একমত হয়তো পোষণ করি না, তবে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। ২০১২/১৩ সালের দিকে তিনি যখন বিভিন্ন শিরোনামে ইসলামের নামে সাম্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তুলে ধরতেন, তখনই এই বিষয়ে চিন্তা হচ্ছিলো যে উনি ভিন্ন পাত্রে মদ খাওয়াচ্ছেন। এটা বুঝতে আসলেই কেন যেন অনীহা আমাদের।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** ইসলামের দিক থেকে পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদ দুটোরই কিছু ভালো দিক আছে, কিছু খারাপ দিক আছে। এক অর্থে ইসলাম যেমন সাম্যবাদী, অন্য অর্থে ইসলাম তেমন পুঁজিবাদী। যে ধর্ম বা আদর্শের পাঁচটা স্তম্ভের একটা হলো কম্পালসারি চ্যারিটি তথা যাকাতব্যবস্থা, সেটি শ্রেণীহীন সাম্যবাদী কোনো আদর্শ হতে পারে না। আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেভাবে পুঁজিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ইসলামের মতো কোনো আদর্শ সেটাকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন করতে পারে না। কথাটা আবার রিপিটেশন করে বললে বলতে হয়, ইসলাম একই সাথে পুঁজিবাদী এবং সাম্যবাদী। অন্যদিক থেকে ইসলাম পুঁজিবাদীও নয়, সাম্যবাদীও নয়।

বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল এসব সাম্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে ইসলামপন্থীরাও তাদের নানা ধরনের রেটরিক ব্যবহার করে তাদের কাছে প্রিয় পাত্র হতে চায়। যারা মানুষকে একটা বস্তু হিসেবে মনে করে, সেসব লোকেরা সাম্যবাদের মাধ্যমে মানবতাবাদ কায়েম করতে চায়। কতইনা বৈপরীত্যমূলক কথাবার্তা তারা বলে! ড. আলী শরীয়তী উনার 'Marxism and other western fallacies' শীর্ষক বইয়ে এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা বইটির অনুবাদের কাজ শুরু করেছি।

Nure Elahi Shafat: মজহার মতবাদ ও তার এজেন্সির বিপদগামিতা সম্পর্কে শুধু একজন মোজাম্মেল হক স্যারের প্রতিবয়ানের দিকে তাকায়ে থাকলে হবে না। বরং নিজ নিজ বলয় হতে সহজিয়া 'সাম্যবাদী ইসলামের' বিরুদ্ধে আপনাদের ইসলামনিষ্ঠ বৃদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাশীলতা জারি রাখেন। সলিমুল্লাহ যেভাবে শাহবাগীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে শাহবাগের পরাজিত শক্তির নখদন্তহীন প্রাণীতে পরিণত হয়েছেন, ঠিক অন্যভাবে সহজিয়া সাম্যবাদী ইসলামের মার্কসিস্ট অলী হযরত ফরহাদ মজহারের প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তার ভাবান্দোলনকে মোকাবেলা করেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হাঁ, ঠিক তাই। চিন্তাকে মোকাবেলা করতে হবে চিন্তা দিয়ে। 'সহজিয়া সাম্যবাদী ইসলাম' যে আদতে সর্বেশ্বরবাদ ও নাস্তিকতার একটা রূপ সেটা বুঝতে হবে। অবুঝদেরকে বোঝাতে হবে। কেউ বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। মজহারের ইসলাম প্রজেক্ট যে খুবই মারাত্মক একটা ষড়যন্ত্র সেটা সরলমনা ইসলামপন্থীদের কাছে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

Farid A Reza: চমৎকার! দর্শন পাঠ করলেও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ করিনি। পাঠ করেছি পরীক্ষা পাশ এবং নিজের কৌতুহল নিবারণের জন্যে। দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত প্রিয়ভাজন মোজাম্মেল হক সহজ ভাষায় বিষয়টা বিশ্লেষণ করতে পারেন। আমার মতো সাধারণ পাঠকদের জন্যে নতুন যুগের দার্শনিকদের সাংঘর্ষিক এবং দ্ব্যর্থবোধক মন্তব্য অনুধাবন করা সহজ নয়। আরো কঠিন এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ। যেসব বিষয় আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে সেগুলো নিয়ে আমরা অধ্যাপক মোজাম্মেল হকের নিকট থেকে আরো আলোচনা আশা করি। তবে আলোচনা সাবজেক্টিভ না হয়ে অবজেক্টিভভাবে হলে ভালো হয়। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ, আলোচনা খানিকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। সেজন্য আমি দুঃখ প্রকাশও করেছি। তবে, কাজের বাস্তবসম্মত পন্থা হলো অতিব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং তথাকথিত নিরপেক্ষ নৈর্বেক্তিকতা, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা।

Hasan Morad Siddique: ফরহাদ মজহারের চিন্তার কাছাকাছি পৌঁছুতে আপনাকে কয়েক শতাব্দি মেহনত করতে হবে। আগে পড়ালেখা চালিয়ে যান, তারপর দার্শনিক ব্যাখ্যার ভুল ধরার চেষ্টা করুন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: বোঝা গেছে, আপনি একজন মজহারী। মজহারের কুযুক্তিসুলভ চিন্তার মোকাবেলায় আমার লেখা ও ভিডিও বক্তব্যে আমি তো রেফারেন্স দিয়েছি। যুক্তি দিয়েছি। চিন্তাকে চিন্তা দিয়ে মোকাবেলা করছি। দু'চারটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কথাও অবশ্য বলেছি। কিন্তু আপনি তো দেখছি নিছকই ব্যক্তিপূজারী। আপনার সাথে আমার হবে না। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়াল ইয়া দ্বীন। ভালো থাকেন। No more engagement please, accept argumentative and logical exchange.

Hasan Morad Siddique: আমাদের সমস্যা হলো, আমরা সবকিছু মামুলিপনার চোখে দেখি। যা ভাবি, বেশিরভাগ ভাসাভাসা ভাবি। সচরাচর ভাবাকে দার্শনিক ভাবায় উন্নিত করতে না পারলে, ফরহাদ মজহার বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ ফরহাদ মজহারকে কয়েকটা প্রবন্ধ বা কলামের উপর মাপাটা অত্যন্ত কঠিন ব্যপার। যে মাপের চিন্তা করতে পারেন, সে মার্গীয় চিন্তক টোটাল বাংলা সাহিত্যে রেয়ার। তাঁর অনেক লেখা এতো এতো উঁচু চিন্তার বুননে ঠাসা যে, অনেকবার গভীর মনোযোগ দিয়ে না পড়লে তলানীতে পৌঁছা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। আগে তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নীরিক্ষণ করেন, পরে তার মতো চিন্তা আপনার মধ্যে গ্রো হয়েছে আত্নবিশ্বাস জমলে, বাহাসে নামবেন, অথবা ভুলবালের হদিস দেবেন। অল্প লেখাপড়া করে ফরহাদ মজহারকে অন্যভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ বৈ অন্যকিছু নয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: কেন আমাকে বা কাউকে 'ফরহাদ গবেষক' বা 'ফরহাদ হাফেজ' হতে হবে? ফরহাদকে বোঝার জন্য যদি ফরহাদের সবগুলো লেখা ভালোভাবে পড়তে হয় তাহলে তো আমাকে বোঝার জন্য

আমার সবগুলো লেখাও ভালোভাবে বুঝতে হবে, আমার সম্বন্ধে কোনো রকমের মন্তব্য করার আগে। এবং এটা যে কারো জন্যই প্রযোজ্য। আপনিই বলেন, এটি কি কোনো বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হলো?

Hasan Morad Siddique: আলোচনাটা ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে না? ফরহাদ মজহারের সাথে আপনার তুলনা দিলে আলাপের পথটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। পদ্ধতিগত আলোচনার জন্য পদ্ধতিগত কমেন্টই আশা করবো।

আনারুল ইসলাম: ফরহাদ মজহার কী এমন দার্শনিক যে তাকে বুঝতে এতকিছু করতে হবে? যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এত এত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ দর্শন থাকতে লালনের বিকার দর্শনকে প্রমোট করে, সে নাকি আবার দার্শনিক! বাংলাদেশে দর্শনের বাজারে এত আকাল পড়ছে এটাই তার প্রমাণ।

Nure Elahi Shafat: "ফরহাদ মজহারের চিন্তার কাছাকাছি পৌঁছুতে আপনাকে কয়েক শতাব্দি মেহনত করতে হবে।" "আগে পড়ালেখা চালিয়ে যান"

১ম বাক্যে বোঝা যায় আপনে মজহারের ফেনাটিক কমরেড। আদতে মজহারের সমকক্ষ হবার কথা বলা ইউটোপিয়া ও খোদ মজহারকে ইন্টেলেকচ্যুয়ালি অপমান-অবমাননা করা। কারণ মানুষের চিন্তার সমকক্ষ সে নিজেই, অন্য কেউ হতে পারে না। জরুরতও পড়ে না। দ্বিতীয়ত আগে পড়ালেখা চালায়া যান বলেছেন। প্রশ্ন করি, আগ-পর নির্ধারণ করার আপনি কে? কেমনে পড়তে হবে এই পাঠের মালিকানা কি আপনার কথার সাথে সম্পর্কিত? শেষে বললেন, তারপর মজহারের দার্শনিক ভুল ধরার চেষ্টা করুন, তারমানে আপনি নিজেও মনে করেন মজহারীয় দর্শনে ভুল আছে, বাঙলাদেশে তিনি অদ্বিতীয় দার্শনিক হবার পরও! So, try to understand you have a fallacious position on your own method. thank you, bro...

Hasan Morad Siddique: আপনি যদি আমাকে মজহারিয় দর্শনের পছন্দের তালিকায় দেখতে চান, অস্বীকার করার জো নেই। কারণ পুরানা হেরাক্লিটাস থেকে হালের নোম চমস্কি পর্যন্ত আদ্যোপান্ত দর্শনের ধারণা

অন্য অনেকের মতো তাঁর সেও আমাকে আলোড়িত করেছে। বাংলাদেশে দর্শন শাস্ত্রের পাঠ, ব্যাপ্তি এবং চর্চার প্রাণ পুরুষের তালিকায় ফরহাদ মজহার সামনের কাতারের। তাঁর দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনি কতটুকু অবগত আছেন জানি না, তবে তাঁর প্রস্তাবিত কনসেপ্টের সামান্যও যদি আপনার আইডিয়া থাকে তাহলে তাঁর সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্যে প্রাণ কাপতো।

দর্শন ব্যতিত বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গায় ফরহাদ মজহারের যে অবদান, এবং একটি প্রগতিশীল, জ্ঞান ভিত্তিক প্রজন্ম বিনির্মানে তাঁর যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। আপনি যদি চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করেন, সনাতন সমাজ ব্যবস্তার ঘোরতর সমর্থক হোন, কিংবা রাষ্ট্রের অচলায়তন যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরের আমূল পরিবর্তন না চান, তাহলে ফরহাদ মজহারে আপনার এলার্জি থাকাকে স্বাভাবিক বলতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি একটি স্বপ্নবান তারুন্যের নাতুনিক প্রজন্মকে বেগবান স্রোতে অবগাহনের চেষ্টা জোরদার করতে চান, পুরানা জীবনবোধের গোড়ায় কোপ মেরে একটি কাঠামোগত এবং অভিনব জীবনবোধ সংশ্লেষে আমূল পরিবর্তিত জাতির আশা করেন, মুক্ত চিন্তার দ্ব্যর্থহীন সারথির মিছিলের স্রোতে দেশের অগ্রগতির প্রত্যাশা জিইয়ে রাখেন এবং কৃৎকৌশলের অভিনব উদ্ভাবনায় মেধা ও মননের মিশিলে অপরাপর সভ্যতার সাথে পাল্লা দিতে অন্য অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক ঝলমলে দীপ্ত পুরুষদের সাথে ফরহাদ মজহারের নাম আভা ছড়াবে।

গাড়িতে থাকার কারণে অনেক বানান সঠিক হয়নি বলে দু:খিত।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ফরহাদ মজহার এর কথার মধ্যে তাও তো কিছু যুক্তি থাকে। আপনার এই অতি বড় কমেন্টের মধ্যে কথার ফুলঝুরি এবং বাগাড়ম্বর ছাড়া কোনো যুক্তি তো দেখলাম না!

Masudul Alam: ফরহাদ মজহারের দার্শনিক প্রস্তাবনাটা কী?— আমি এই প্রশ্নটা ফরহাদ ভক্তদের অনেককেই করেছি। এখন পর্যন্ত কনক্লুসিভলি কিছু কেউ বলতে পারেনি। আশা করছি ফরহাদ মজহারের একজন ভক্ত-অনুসারী হিসেবে আপনি উত্তরটা দিয়ে যাবেন। আর কোনো

বই, আর্টিকেল বা বক্তৃতার লিংক ধরিয়ে দেবেন না, প্লিজ। সংক্ষেপে এক/দুই প্যারায় কিছু বললে খুশি হবো।

Siddikul Islam: ফরহাদ মজহার হতে এক সেকেন্ডও লাগে না কিন্তু একজন মুসলিম হতে হলে নিয়মিত দ্বীন ইসলাম মানতে হয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: এবং সত্যপন্থী একটা মন লাগে। যা সদা সর্বদা বিবেকের অনুসরণ করে।

আমরা জানি, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে কোনো এক সময় এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মাটিতে একটি সোজা রেখা আঁকলেন এবং বললেন এটি হচ্ছে ইসলাম। আর এর আশেপাশে অনেকগুলো বক্ররেখা টানলেন। এরপর বললেন, এগুলো হচ্ছে অন্যান্য দ্বীন।

ইসলাম হচ্ছে অত্যন্ত সহজ-সরল এবং অকাট্য যুক্তির জিনিস। এর কোনো অতীন্দ্রিয় মরমী অথবা সর্বেশ্বরবাদী ব্যাখ্যা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মজহারেরা প্রমোট করেন যে বাউল তত্ত্ব সেটা অনুসারে মানুষই হচ্ছে ঈশ্বর। মানুষের যৌনতার মাধ্যমে ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই বাউল তত্ত্বের পক্ষে যিনি বলেন তিনি কীভাবে ইসলামের পক্ষের লোক হতে পারেন, সেটা আমার কখনও বুঝে আসে না। ইসলাম সম্পর্কে যে কেউ বলতে পারেন। গবেষণা করতে পারেন। কিন্তু নিজেকে ইসলাম অনুসারী, ইসলামপন্থীদের একজন হিসেবে দাবি করে ইসলামবিরোধী কোনো কিছু ফেরি করে বেড়াতে পারেন না। যেটা ফরহাদ মজহার করছেন। এজন্যই উনার বিরোধিতা।

Jaber Ahmed: স্যার, আপনার কথার টোনে বিষেদগারের ছাপ স্পষ্ট, নিজেকে প্রো-একটিভ ইসলামিস্ট দাবি করা ব্যক্তির থেকে এরকম আচরণ হতাশাজনক। আমি ঠিক শিওর না কেন আপনি এভাবে কথা লিখলেন। তাঁর ব্যক্তিগত আর নির্বিবাদে পাঠচক্র করার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আমি শুধু বলবো, আপনিও একটা ক্রান্তিকালে আপনার পুরাতন মতবাদ ছেড়ে নতুন রাস্তা ধরেছেন, কিন্তু আমি অন্তত এটাকে ভীরুতা বা অন্য নেতিবাচক কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে বরং আপনার চিন্তা বদলেছে তাই রাস্তা বদলেছেন এমনটাই ভেবে নিয়েছি। আমি আপনাদের দুইজনের চিত্তাকর্ষক মিথস্ক্রিয়া দেখতে আগ্রহী, আমি কারোরই সমর্থক নই। এরকম ডিবেটে আলোচনায় বিপক্ষের পয়েন্টকে সর্বোচ্চ

benefit of the doubt দেয়া, charitable explanation দেয়া ইত্যাদি ভালো ডিবেটের জন্য সহায়ক, যা এখানে আমার মনে হয়েছে অনুপস্থিত। স্যার, আপনার সামান্য গুণমুগ্ধ ফলোয়ার হিসেবে এই কথাগুলো বললাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: জনাব ফরহাদ মজহারের আলোচনার তথা উনার যে স্ট্যাটাসটার ব্যাপারে আমি কাউন্টার করেছি সেখানকার পয়েন্টগুলো যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন, সেগুলোর ব্যাপারে আমি সুনির্দিষ্ট কথা বলেছি। সেগুলোকে খণ্ডন করে আমি অকাট্য যুক্তি দিয়েছি। কোরআন-হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। আপনার জ্ঞাতার্থে এখানে উনার শুরুর পয়েন্টটাকে একটু সংক্ষেপ তুলে ধরছি:

সামাজিক চুক্তি পূর্ববর্তী প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের চরিত্রকে টমাস হবস নেতিবাচকভাবে তুলে ধরেছেন। ফরহাদ মজহারের দৃষ্টিতে এটি ভুল। আমি বলেছি, হবসিয়ান সামাজিক চুক্তি মতবাদ ছাড়াও জন লক ও রুশোর যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ আছে সেখানে কিন্তু মানুষের চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে সামাজিক চুক্তির এই হাইপোথিসিসগুলো একসাথে পাঠ করানো হয়। কোথাও এর কোনো একটাকে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ানো হয় না। উনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এর একটাকে নিয়ে পূর্বাপর বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা শুরু করেছেন।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি যদি সামাজিক চুক্তি মতবাদ হয়ে থাকে সেটা নেসেসারিলি বা এক্সক্লুসিভলি হবসিয়ান নয়। বরং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হলো জন লকের রাষ্ট্রদর্শন। যেখানে তিনি লাইফ, লিবার্টি এন্ড ইকোয়ালিটির কথা বলেছেন। সামাজিক চুক্তির একটি অধিকতর ও সুসংহত ও সমন্বিত চিত্র তুলে ধরেছেন যেটি আমার ভিডিও বক্তব্যে আমি ক্লারিফাই করেছি।

এমনকি হবসের যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সেখানেও দেখা যায় রাষ্ট্রনায়ক বা শাসক, যাকে তিনি লেভিয়াথান বলেছেন, তিনি অর্থাৎ সে লেভিয়াথান নিজে নিজে এসে মানুষের উপর চেপে বসেন নাই। বরং মানুষরাই নিজেদের বৃহত্তর কল্যাণ ও সুবিধার কথা চিন্তা করে তাদের সমস্ত ক্ষমতা শর্তহীনভাবে তেমন উপযুক্ত একজনের হাতে সমর্পণ করে তাকে রাজা বা সম্রাট বা নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এ থেকে আমরা এটাও বুঝতে

পারি, এমনকি হবসের প্রস্তাবনাতেও মানুষের চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলোর পাশাপাশি একটি বৃহত্তর ও ইতিবাচক দিকের কথাও এসেছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। এভাবে নিজেরা নিজেরা হানাহানি করার চেয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভেবেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এমনকি হবসের ব্যাখ্যা মোতাবেকও মানুষ সর্বাংশে খারাপ নয়।

উপযুক্ত শাসন কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে মানুষ যে মন্দপ্রবণ, সেটাকে কি ইসলাম অস্বীকার করে? নবী-রাসূল কেন প্রেরণ করা হয়? খলিফার দরকার কেন? আমীরের দরকার কেন? খলিফার প্রতি আনুগত্য কেন? ক্ষমতার এত গুরুত্ব ইসলামী শরীয়তে কেন? এই সব কেন'র উত্তর যদি কেউ পেতে চায় তাহলে সে দেখবে যে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রহীন শ্রেণীহীন একটি সুষম সমাজ কায়েম করে ফেলবে— মানুষ সম্পর্কে ইসলাম কখনো এরকম উর্বর অথচ অবাস্তব কল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করেনি।

বরং মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ দুটো প্রবণতাই আছে, এটিই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে ইসলামের প্রস্তাবনা। হবসের কিংবা সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে যারা কথা বলেছেন তাদের প্রত্যেকেরই এই প্রস্তাবনা।

আমার এই কথাগুলোর আলোকে যদি ফরহাদ মজহারের কথার এই পয়েন্টটাকে বিবেচনা করলে বুঝতে পারবেন, কীভাবে তিনি ফিলোসফির একটি সামগ্রিক আলোচনার বিশেষ একটা দিককে বিশেষভাবে চিত্রায়িত করে ওই বিষয় সম্বন্ধে যারা তেমন ভালো জানে না, তাদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

উনার পুরো বিষয়টা নিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা দিয়ে এখানে নতুন একটা লেখা তৈরির সুযোগ নাই। আপনার আন্তরিকতা এবং আমার প্রতি আপনার ভালোবাসার কারণে এই পয়েন্টেকে আমি একটু ব্যাখ্যা করে আপনাকে বললাম। এভাবে আমি উনার বক্তব্যের প্রত্যেক পয়েন্টকে অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু খুব ভালোভাবে রিফিউট করেছি।

হ্যাঁ, আমার কথার মধ্যে ক্ষোভ আছে। ভাষার মধ্যে অসংযত কিছু আছে। সেটা তো আমি আমার লেখাতেই স্বীকার করেছি। সেটার কারণ কিন্তু শুধুমাত্র ফরহাদ মজহার নন। বরং উনার পাঠচক্রে বসে থাকা আমার

পরিচিত দুজন ব্যক্তি। ছবিতে যা দেখলাম। তাদের মধ্যে একজন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। আরেকজন ছাত্রশিবির পূর্ববর্তী ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য ছিলেন। তারা যখন মজহারের শিষ্যত্ব নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে উনার এসব বক্তব্য বিনা প্রতিবাদে গিলতে থাকেন তখন আমার বেশ খারাপ লাগে।

উনাদের একজনকে আমি এ নিয়ে কোনো এক সময়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন ফরহাদ মজহার নাকি উনার দাওয়াতী টার্গেট। তখন আমি উনাকে বলেছিলাম, "একই সাথে আপনিও কিন্তু উনার দাওয়াতী টার্গেট।"

যাহোক, কথা বললে অনেক কিছুই বলা যায়। আমার ওই পরিচিত ব্যক্তিবর্গসহ এখানকার বামপন্থীদের খুব সিনিয়র পর্যায়ের কেউ কেউ চেয়েছিলেন, আমার সাথে যাতে ফরহাদ মজহারের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হোক। কিন্তু উনার এই সাম্যবাদী সহজিয়া ইসলামকে আমি কখনো মানতে পারিনি। লোকটাকে কখনই আমার কাছে তেমন ভালো লাগেনি। যদিও উনার অনেক গুণের আমি স্বীকৃতি প্রদান করি। উনার এহেন নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। কাজের দিক থেকে আমি উনার মতোই হতে চাই। এই অর্থে বলতে পারেন, তিনি আমার কাছে একজন আইকন। তবে উনি যা কিছু বলতে চান, সেটি আমার দৃষ্টিতে ভীষণ আপত্তিজনক।

সেটাও আসলে মূল সমস্যা না। সমস্যা হলো, ওই যে উপরে একটু করে বললাম, উনার পিছনে যারা ঘুরেন, আমি চাই না তারা উনার পিছনে ঘুরুক। অনেকের ক্ষেত্রে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, যারা উনার ডেরায় গেছে, তারাই কোনো না কোনোভাবে কন্টামিনাটেড হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্তও তারা ওই চিন্তার সংক্রমণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেনি।

এ ধরনের আরো অনেকেই একাডেমিকভাবে ইসলাম চর্চা করেন। যেমন রেহনুমা আহমেদ। তাতে আমার গা জ্বালা করার কোনো কিছু নাই। এই লোকটা যেভাবে ইসলামপন্থীদের ভিতরে একটা অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে, সেটা আমার কাজের ক্ষেত্রের সাথে একটা কনফ্লিক্ট অলরেডি তৈরি করেছে। যার কারণে আমি বাধ্য হয়ে উনার বিষয়ে এনগেইজ হয়েছি। That's all.

Mahbubur Rahman Alam: একটি প্রশ্ন— ক্ষমতার প্রতি গুরুত্ব মানে? কোথায়? নাকি, ক্ষমতায়িত ব্যক্তির রেসপন্সিবিলিটিকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে? বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব হচ্ছে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভারসাম্যের ব্যাপার। এগুলাকে এইটা, নাকি ওইটা, কিংবা এই দুইটার মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এইভাবে 'আইদার অর' হিসাবে ভাবা ও এই অনুমানকে সামনে রেখে কোনো আলোচনাতে এনগেইজ হওয়াটাকেই ভুল বলে মনে করি।

Mahbubur Rahman Alam: অনেক বিষয়ে মন্তব্য আছে। তবে আপাতত একটি বলি। কুরআনের শুধু বঙ্গীয় অনুবাদ পড়েই যদি রাষ্ট্রের সবকিছু বুঝে ফেলতে কেউ সক্ষম হতো, তাহলে ইউরোপীয় বাদ দিলাম, মুসলিম ইতিহাসে এত বড় বড় আলেম-উলেমা আর মুসলিম স্কলারদের যুগে যুগে এত কদর করা হয়েছে কেন? ইসলামী সামাজিক সুবিচার নীতিমালা রাষ্ট্রে কায়েম করা আর ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া তো ভিন্ন কথাই। এ দুয়ের মধ্যে যে একটি অতি সূক্ষ্ম অথচ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে তার পর্যালোচনা কীভাবে করবেন? ইন ফ্যাক্ট, আপনি কিছু ক্রিটিক আগে করেছেন, বাট এখানে সেগুলো অনুপস্থিত।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে আমার সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা আছে। সেগুলো 'ইসলামী মতাদর্শের আলোকে সামাজিক আন্দোলন' শিরোনামে 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্রের' সাইটে আপ করা আছে (cscsbd.com/556)। এই নিয়ে এখানে আর নতুন করে কথা শুরু করতে চাচ্ছি না।

আমি বলেছি, 'ইসলামী রাষ্ট্রের' ঘোষণা দেয়া বা না দেয়া খুব একটা ম্যাটার করে না। কিন্তু যারা বলে, ইসলামী রাষ্ট্র কার্যত হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে নামে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে না বা বলার দরকার নাই, তাদের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি। এরই সাথে যারা মনে করে, কার্যত থাকার পাশাপাশি নামেও একটি রাষ্ট্রের নাম ইসলামী রাষ্ট্র হতেই হবে, তাহলেই কেবল সেটা একটি সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র হবে— তাদের সাথেও আমি দ্বিমত পোষণ করি। ভিডিও বক্তব্যে আমি এই বিষয়ে কথা বলেছি।

Mahbubur Rahman Alam: এটিই হচ্ছে দারুণ গ্রে এরিয়া। এখানেই

কাজ চলতে থাকবে লক্ষ কোটি বছর। এই একটু জায়গায় ব্ল্যাকহোলের মতো। নাম নিবেন নাকি নেবেন না, এটুকুই দার্শনিক আর প্রফেসরদের কাজ। তবে এই আলোচনায় নিজেদের মতামত দিয়ে চুপ হলে চলবে না। বরং এই জায়গাটাকে এলাস্টিকের মতো টান দিয়ে বড় করে মাইক্রোস্কোপ সেট করতে হবে। তখন বের হবে শত শত ইন্ডিকেটর। এই ইন্ডিকেটর নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আশা করি এই জায়গায় ফরহাদ মজহার, নুরুল কবির, সলিমুল্লাহ খান, আপনারা মিলে কিছু ইন্ডিকেটর বের করে বলবেন, কোনটি জনগণের জন্য সুবিধাজনক, আর কোনটি ক্ষতিকর। তার উপর ভিত্তি করেই তৈরি হবে মতামত। এর পরের প্রজন্ম এখানে এসে আপনাদের করা কাজের উপর আবারো মাইক্রোস্কোপ বসিয়ে জনস্বার্থে অবদান রাখবে। সভ্যতা আগাবে এভাবেই, ইনশাআল্লাহ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইসলামের তরফে দেশ জাতি সমাজ ও জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু করার তা সম্পন্ন করার জন্য ইসলামকে যারা own করে না, তাদের সাথে বসে কোনো কার্যব্যবস্থা গ্রহণ বা কোনো কার্যকর মতামত গঠনের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নাই। কেননা, ইসলামকে আমি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করি। এবং নিজের ওপর আমার যথেষ্ট কনফিডেন্স আছে। এবং আমি মনে করি, আমার মতো এরকম আত্মবিশ্বাসী বহু ইসলামপন্থী অতীতেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

Nure Elahi Shafat: সলিমুল্লাহ খান, ফরহাদ মজহার, মোজাম্মেল হকেরা মিলে ইন্ডিকেটর বের করবে! হাউ ফানি। আপনি মতাদর্শরে গুলায়া ফেলে ককটেল চিন্তার কথা বলতেছেন। করতেই পারেন, যেটা মজহারের কমিউনিজামাইজেশন অব ইসলাম প্রকল্প। মজহারকে রাষ্ট্রব্যবস্থার (ইসলামী রাষ্ট্র/ সিভিল রাষ্ট্র। লেভিয়াথান নয়) সহযোগী মনে করাই মজহার প্রকল্পের বিরোধিতা। মার্ক্সিস্ট সেক্যুলারিস্ট পুঁজিবাদীর সাথে বসা যায়, আলাপ বয়ান তৈরি করা যায়; কিন্তু লেভিয়াথান রাষ্ট্রের স্ট্রাকচারাল পাওয়ারকে হ্রাসকরণ/ দমাতে যে পদ্ধতি অনুযায়ী এগোতে হবে সেটার সাথে মার্ক্সিজম আর ইসলামপন্থার চিন্তা-কর্মধারা পরস্পরবিরোধী। সেটাই সামাজিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন।

অনেক জায়গায় সাদৃশ্য পাবেন নানান ইডিয়োলজির, কিন্তু বস্তুবাদিতা আর

তওহীদপন্থার জায়গায় সিম্বলিক/কল্পচিন্তার অভিলাষ নিতান্তই আড়ম্বর ও শিশুসুলভ প্রস্তাব।

আমি বুঝি না মোজাম্মেল স্যারের লেখার/ভিডিওর সারতত্ত্বই অনেকে ধরতে পারে নাই। মজহার নিয়ে উনার ক্রিটিক হচ্ছে নবুয়তকেন্দ্রিক রাষ্ট্র সভ্যতার আলোকে। সিভিক ও ইউরোপীয় লিবারেল অর্থে নয়। মিস্টার মোজাম্মেল হক ক্লিয়ার্ড দ্যা ক্রিটিকস অন মজহার্স মেথোডলজি।

আর নাম নেয়া শুধু দর্শনবিদ ও অধ্যাপকেদের কাজ না। সমাজকর্মীর কাজও বটে।

Mahbubur Rahman Alam: Nure Elahi Shafat, আমি বা আপনি কেউই প্রফেট নই, কাজেই ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। যাক, 'নবুয়তকেন্দ্রিক রাষ্ট্র সভ্যতা' এটা কী? একটু ব্যাখ্যা করবেন? এটার ক্রিটিক পরে। আগে জিনিসটা বুঝে নেই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: 'নবুয়তকেন্দ্রিক রাষ্ট্র সভ্যতা' সম্বন্ধে বলতে পারবো না। তবে, এর কাছাকাছি একটা কথাকে [নবুয়তকেন্দ্রিক সভ্যতার ধারণা] হেডলাইন করে আমি এই স্ট্যাটাসটা দিয়েছি। যার ব্যাখ্যা স্ট্যাটাসের মধ্যেই সংক্ষেপে দিয়েছি। এখানে তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

"কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বার বার 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের' কথা বলেছেন। আমরা জানি। শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতিরেকে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' অসম্ভব। আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা মন্দ কাজকে হাত দিয়ে বাধা দাও। না পারলে প্রতিবাদ করো। তা না পারলে সেটাকে ঘৃণা করো।" আমরা জানি, যাকাত থাকা মানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থাকা। শ্রেণিহীন সমাজে যাকাত নামক ইবাদত থাকার প্রশ্ন উঠে না। আমরা জানি, যাকাত একটা ত্রিপাক্ষিক ব্যাপার: (১) দাতা, (২) আদায়কারী কর্তৃপক্ষ ও (৩) গ্রহীতা। তো, এই আদায়কারী কর্তৃপক্ষকে নিয়োগ দিবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের তরফে ক্ষমতাসীন সরকার। জুমা ও ঈদের নামাজে এবং হজ্বের সময়ে আরাফাতের ময়দানে খুতবা দিবে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি। জিহাদ ঘোষণা ও পরিচালনা করবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। ইসলামে ধর্ম ও শাসনক্ষমতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটি অচল ও অকার্যকর।

শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়া ইসলাম ‘ধর্ম’ পালন করা অসম্ভব। ইসলাম অবশ্য অগত্যা পরিস্থিতিতে মানুষকে প্রয়োজনীয় ছাড় দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকা বা ন্যূনতম মানে না থাকা সত্ত্বেও এই রুখসত বা ছাড়ের কারণে মানুষ দুর্বল মানে হলেও মুসলমান হিসাবে জীবনযাপন করতে পারে।”

Mahbubur Rahman Alam: স্যার, এই বাক্যগুলার প্রত্যেকটাই হচ্ছে মুসলিম স্কলারদের মতামত। এসবগুলোতেই বিতর্ক বা ডেভেলপ করার সুযোগ রয়েছে। এগুলো আল্লাহ আর রাসূলের নামে চালানো যাবে না। এগুলোকে আমাদের আন্ডারস্টান্ডিং হিসাবে ধরে ফর্মুলা এগিয়ে নিতে হবে। এই স্পেসটা হচ্ছে আমাদের (মুসলিম স্কলারদের) উন্নয়নের জায়গা। কাজেই এগুলাকে ফর গ্রান্টেড ধরা যাবে না। যেহেতু ধরা যাবে না, সেহেতু কুরান-হাদিসের অনুবাদ করেও উদ্ধৃত করা যাবে না। বরং আমাদের আন্ডারস্টান্ডিং হিসাবে ধরে বাক্যকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তখন দেখবেন, স্কলারদের টোন আর টিউন পালটে যাবে। সেসব নতুন বাক্য অনেক কম্প্রিহেন্সিভ। এ জায়গায় প্রচলিত আলেমদের অনেক বড় একটা গ্যাপ রয়েছে। আশা করি, আপনাদের হাত ধরে সেই গ্যাপটা দূর হবে। এতে আরেকটা বড় কাজ হয়ে যাবে। সেটি হচ্ছে সালাফিজম বা ওয়াহাবি মতবাদের যে জঙ্গী চেতনা, সেটা নতুন ডিসকোর্সের উন্নয়নের সাথে সাথে দুর্বল হয়ে পড়বে। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: মুসলিম স্কলাররা কিছু বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। আমি সেসব বিষয়ে তাদের অনুসারী। আর কিছু বিষয়ে মুসলিম স্কলারগণ পরস্পরের সাথে মতবিরোধ করেছেন। সেসব বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে আমি মুসলিম স্কলারদের কোনো না কোনো পক্ষের সাথে। অভিনব কোনো পক্ষের সাথে থাকার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নাই।

Mahbubur Rahman Alam: আরেকটি পয়েন্ট; ইসলামকে রাষ্ট্র ছাড়া মানা যায় না, ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায় না, বা ভালো কাজের আদেশ বা খারাপ কাজের নিষেধ কীভাবে করা যাবে রাষ্ট্র ছাড়া? এই সিলি কোয়েশ্চিনটি অনেককেই মিসলিড করে। আপনিও দেখছি সেই ভ্রান্ত যুক্তিটি ব্যবহার করেছেন। কারণ মহান আল্লাহর কুরানের বিধানকে যদি ১৯৪৭, কিংবা ১৯৭১ সালের পাওয়া ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গমাইলের সীমানার ভেতর আটকিয়ে

ফেলেন, যেখানে আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে, তাহলে ক্যামনে কী হলো? বাঙ্গালীর সীমানার জন্য কুরানের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজন বুঝলাম। তাহলে, ভারতীয় সীমানার ভেতর কোন কুরানীয় বিধান চলবে? কুরানীয় বিধানকে আইন হিসাবে দেখলে সমূহ বিপদ। কারণ, কুরানীয় হালাল-হারাম কিংবা শাস্তির বিধানের দার্শনিক নুয়াঙ্গেস অনেক গভীর। একে কোনোভাবেই রাষ্ট্র কাঠামোর সংসদীয় আইনের সাথে কিংবা সাহাবীদের তৈরি করা বা মুসলিম ইতিহাসের কোনো আইনের সাথেই মেলানো উচিত নয়। বরং রাষ্ট্রের জন্য কুরান সুন্নাহকে সোর্স ম্যাটেরিয়াল হিসাবে রেখে দিয়ে জাস্টিসের ভিত্তিতে মানবীয় আইন রচিত হতে পারে, যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলবে। এতে রচিত আইনের বিভিন্ন অংশ নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতেই থাকবে। আলোচনার মাধ্যমে অধিকতর জাস্টিসের পথ তৈরি হবে।

কুরানে আছে এমন বিধান বাস্তবায়নের জন্য কোনো কিছু করা আবশ্যক? নাকি, জীবনযাপনের পর্যায়ে যেই নীতিমালা প্রাসঙ্গিক, সেটি মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ? এ তো দেখছি, জীবনের জন্য আইন না হয়ে, আইনের জন্য জীবন হয়ে গেল। কুরান-হাদিসসহ কোনো আইনই প্রয়োজনের আগে তৈরি হয়নি, নাযিলও হয়নি। এজন্যই কুরানের আয়াত পড়ার সাথে সাথে আমরা তার শানে নুযুল বা প্রেক্ষিত খুঁজতে থাকি। অবশ্য, বর্তমানের কুরান আমাদের জন্য আগেই নাযিলকৃত। কিন্তু তা আল্লাহ তায়ালা এক সাথে আইনী বা গাইডলাইন বই আকারে পাঠিয়ে দেননি।

এ হিসাবে, ফরহাদ মজহার বরং এই আলোচনা তুলে এনে বাঙ্গালী জনপদে ভালো কাজ করেছেন। অন্যরা এই সুযোগে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে। আপনারও অবদান রাখার পথ হবে, এই সুযোগে। কাজেই, মধ্যযুগীয় ইহুদী চার্চের মতো যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনাকে ধর্মের খুবই লিটারেল এবং মিসলিডিং ব্যাখ্যা দিয়ে থামিয়ে না দিয়ে একে এগিয়ে নেয়াই কি উত্তম নয়?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: “ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র ও ইকামতে দ্বীন নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে” (https://youtu.be/kGlN_l33fUc) শীর্ষক আমার এই বক্তব্যটা শোনেন। এরপরও যদি এ বিষয়ে আমার সাথে একমত হতে না পারেন তাহলে অন্তত এই বিষয়ে আপনার সাথে আমি আর কথা চালিয়ে যেতে আগ্রহী নই।

Mahbubur Rahman Alam: সবই ছিল, বা আছে, বা আপনি ধারণ

করেন বলেই জানি। কিন্তু হঠাৎ করে এই আলোচনায় সবকিছুই নাই হয়ে গেছে। এজন্য আলোচনা করার সময় শব্দ, বাক্য, যতিচিহ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ্যানিহাউ, ধন্যবাদ।

Masudul Alam: ভাই, আপনার কাছে সিম্পলি জানতে চাই, মতাদর্শিক জায়গা থেকে ফরহাদ মজহার সম্পর্কে আপনার অবস্থান কী?

Mahbubur Rahman Alam: খুবই সিম্পল? ইবাদাতমূলক ফতোয়ার জন্য আমি কখনোই তাকে খুঁজি না। বরং সামাজিক সমস্যার গভীরতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলেই আমি দার্শনিক বা সমাজচিন্তকদের মুখোমুখি হই। তবে যে ব্যক্তি নিজেকে মার্ক্সীয় চিন্তার দাবি করে, তাকে আমি এ্যান্টি-ইসলামিক বা নন-মুসলিম বা অন্য কোনো নেগেটিভ শব্দ দিয়ে পরিচিত করতে চাই না। এটি যে ব্যক্তির পরিচয়, সে করবে। এজন্যই দেখবেন, সাধারণ আলেমদের মুখে খই ফুটে। কিন্তু তারিক রামাদান বা হামযা ইউসুফরা কথা বললে পাগলের মতো শব্দ খুঁজে বেড়ায়। দশ মিনিট কথা বললে ঘেমে যায়।

Masudul Alam: আপনার কাছ থেকে সরাসরি উত্তর আশা করি। এ রকম 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' মার্কা উত্তর আশা করিনি। তারপরও যা বলেছেন, তা থেকেই বলি, আপনার দৃষ্টিতে ফরহাদ মজহার কি নিছকই একজন মার্ক্সিস্ট বা কমিউনিস্ট? নাকি তিনি এমন একজন কমিউনিস্ট, যিনি নিজ মতাদর্শের স্বার্থে ইসলাম সম্পর্কে নানান বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে থাকেন?

হাসান রিয়াদ: আমার শুধু অবাক লাগে লালনীয় ইসলামিস্ট এই ফরহাদ মজাহারকে চিনেছি নয়াদিগন্ত দিয়ে। আর শিবিরের প্রোগ্রামে সাবেক একজন কেন্দ্রীয় সভাপতির মুখে উনার লেখালেখি, চিন্তা-দর্শনের সুনাম শুনে। 😑

সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে ফরহাদ মজহার ও আমাদের চিন্তার সংকট

ফরহাদ মজহার। আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি। মতাদর্শগত দিক থেকে বিরোধী পক্ষের হলেও কর্মপ্রচেষ্টার দিক থেকে যিনি আমার কাছে একজন অনুকরণীয় ব্যক্তি। উনার মতো এতদিন অ্যাক্টিভ থাকবো কিনা, আদৌ বাঁচবো কিনা, সন্দেহ। এই বয়সেও যেভাবে এমনকি বিপরীত আদর্শের লোকদেরকেও তিনি নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছেন, এটা বিস্ময়কর। এমেইজিং! দ্যাটস হোহাই, আই স্যালুট হিম।

২৩ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে এক ফেইসবুক স্ট্যাটাসে তিনি বলেছেন,

> “আধুনিকতার দোষে দুষ্ট কওমি তরুণদের একাংশের কারনে দেওবন্দী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি হয়েছে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ... দ্বীনি শিক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কারো স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়।
>
> যে আধুনিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে তারা সনদ গ্রহণ করবে, সেই রাষ্ট্র আল্লাহকে নয়, নিজেকেই সার্বভৌম গণ্য করে।
>
> যে সার্বভৌম শক্তির সনদ নিয়ে কওমি মাদ্রাসার তরুণরা 'স্বীকৃত' হবে সেটা আল্লার সন্তুষ্টি বিধান নয়, বরং আল্লার বিকল্প আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি।”

৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে ‘ইসলাম প্রশ্ন ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতি’ শীর্ষক এক ফেইসবুক স্ট্যাটাসে তিনি বলেছেন,

> “কোরান হাদিস সারাজীবন পড়লেও পর্যালোচনার ক্ষমতা বা বোঝাবুঝির

> চর্চা যদি বিকশিত না হয় – অর্থাৎ দার্শনিক বিচারে অক্ষমতা থেকে যায়, তাহলে এই ধরনের দুর্দশা ঘটতেই থাকবে। ... আমার আগ্রহ দর্শন বা ভাব চর্চায়।
>
> আধুনিক রাষ্ট্রের 'সার্বভৌমত্ব' সংক্রান্ত দাবি মওলানা (ভাসানী) অস্বীকার করেন, কারন তা আল্লার সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে।"

এরপর ২৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে শিরোনামবিহীন আর একটা ফেইসবুক স্ট্যাটাসে তিনি বলছেন,

> "গণতান্ত্রিক হোক কিম্বা অগণতান্ত্রিক, তথাকথিত আধুনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার ধারণা মূলত খ্রিস্টিয় ধর্মতাত্ত্বিক অনুমান ও চিন্তার ওপর দাঁড়ানো।
>
> ইসলাম কোন ব্যাক্তি বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না। খ্রিস্টিয় রাষ্ট্রের গায়ে ইসলামি জোব্বা পরিয়ে যারা ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়, কিম্বা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চর্চার হাতিয়ার হতে চায় তারা মূলত আল্লার সার্বভৌমত্বের বিপরীতে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষে দাঁড়ায়।"

কী বুঝলেন? গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে উনার এই অভিমত খেয়াল রেখে এবার আমরা দেখি 'সংবিধান ও গণতন্ত্র' বইয়ে ইতোপূর্বে তিনি কী বলেছিলেন। 'গণতন্ত্রের সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের মৌলিক সংঘাতটা কোথায়?' শীর্ষক আর্টিকেলে তিনি বলেছেন,

> "গণতন্ত্র' বলতে এই যে ধারণা, এই ধারণার ভিত্তিতে কোন্ মুখে আমরা জামায়াতে ইসলামীর মত প্রকাশের অধিকার ও রাজনীতি করার অধিকারের বিরোধিতা করি?... গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে জামায়াত যদি আল্লার শাসন কায়েম করতে চায় আর কাফেরদের জবাই করতে চায়, তাহলে কোন্ যুক্তিতে জামায়াতের এই পরিকল্পনার আমরা বিরোধিতা করি?
>
> গণতন্ত্রের এই প্রাণধর্মের দিক থেকে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজনীতিকে একবার বিচার করলেই আমরা দেখব যে, মৌলিক সংঘাতটা এখানে গণতন্ত্রের প্রাণধর্মের সঙ্গেই। জামায়াতে ইসলামী ও

ইসলামী ছাত্রশিবির মনে করে না জনগণ সার্বভৌম। তারা বলে আল্লাহ হচ্ছেন সার্বভৌম।

গণতন্ত্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কটা বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে ধর্মের 'সার্বভৌমত্ব' শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই সৃষ্টিজগতের শর্ত হচ্ছেন আল্লাহ, বা আমাদের অস্তিত্বের শর্ত হচ্ছেন তিনি, এই অর্থে আল্লাহ অবশ্যই সার্বভৌম। কারণ দুনিয়া মানুষ সৃষ্টি করে নি, এর সৃষ্টিকর্তাও তিনি। এবং আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই। কিন্তু আমাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন ইচ্ছা ও বিবেক সম্পন্ন করে। এই ইচ্ছা বা বিবেককে ব্যবহার করার সার্বভৌম ক্ষমতাটাও তিনি আমাদেরকে দান করেছেন।

ইসলাম যখন বলে 'আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নোয়াবে না', তখন একথাটার পার্থিব তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, ব্যক্তির ওপর অন্য কারো খবরদারি বা একনায়কী শাসন ইসলাম বরদাশত করে না।"

একই বইয়ে 'জামায়াত রাজনীতির অগণতান্ত্রিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন,

"যদি ব্যক্তি হিশাবে আমার ইচ্ছা ও বিবেকের কোনো সার্বভৌমত্ব না থাকে তবে আমি প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে প্রতি দণ্ডে যা করছি তা আল্লারই ইচ্ছা। পাপপূণ্য সবকিছুই। যদি তাই হয় তাহলে আল্লার ইচ্ছার কারণে কৃত পাপের জন্য মানুষকে কেন দোজখে যেতে হবে? এই ছোট্ট যুক্তিটা বুঝতে পারলেই জামায়াতের সমস্যাটা ধরা পড়বে।

মানুষের ইচ্ছা ও বিবেক যে-অর্থে সার্বভৌম, ইসলাম আল্লাহকে সে-অর্থে সার্বভৌম মনে করে না। ব্যক্তি মানুষের সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সঙ্গে এক করে ফেলা হচ্ছে এক ধরনের শেরেকি – একটি জঘন্য অনৈসলামিক কাজ। এই শেরেকির দোষে জামায়াত অপরাধী।

মানুষের ইচ্ছা ও বিবেকের সার্বভৌমত্ব যেহেতু ইসলাম অবশ্যই স্বীকার করে অতএব মানুষের করে অতএব মানুষের তৈরি সংবিধান, আইন ও প্রশাসনিক কানুনও ইসলামের কাছে সাদরে গ্রহণযোগ্য, যদি তা ন্যায় বিচার, মানুষের কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আল্লার কাছ থেকে যে জ্ঞানের শিখা নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে মানুষের তৈরি সংবিধান, আইন ও শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তারই ক্রম বিকাশ ঘটে। মানুষের

ইচ্ছা ও বিবেকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিপ্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে যেতে থাকে। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তি মানুষের সার্বভৌমত্বকে এক করে ফেলে এ কারণে যে তারা ইসলামের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।”

শেষ পর্যন্ত কী বুঝলেন?

সমকালীন বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তির হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা শ্রদ্ধেয় ‘ফরহাদ ভাই’-এর এ রকম পল্টিমারা কথাবার্তা নিয়ে আমরা কদিন আগে এক খোলামেলা আলাপের ব্যবস্থা করেছিলাম। আড়াই ঘণ্টার এই আলোচনা পুরোটা শোনার পরে এ সংক্রান্ত বিষয়ে যে কারো ভুল ধারণা নিরসন হওয়ার কথা। ‘ঈমানদারদের’ কথা অবশ্য ভিন্ন। উল্লেখ্য, মূল আলোচনায় উদ্ধৃতিসমূহ আরো বিস্তারিতভাবে পঠিত হয়েছে।

ইউটিউবে আমার ‘সমন্বিত সামাজিক আন্দোলন’ চ্যানেলে এটি আপ করা আছে (https://youtu.be/Hxxe4CBuF5A)। ডাটা আর সময় থাকলে দেখেন। বিফলে মূল্য ফেরত ...!

পরিশিষ্ট

বৃটেনের ম্যানচেস্টারে প্রদত্ত ফরহাদ মজহারের বক্তব্য

আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা যারা আমাদের জন্যে দোয়া করছেন সবসময়। এবং আমরা বাংলাদেশে কী পরিস্থিতির মধ্যে আছি ড. তুহিন মালিকের কথা থেকে বুঝেছি। এবং তারমধ্যেও আমরা বেঁচে আছি আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের মোহাব্বতের উপর ভিত্তি করে, দোয়া করেন সবসময়, সেজন্য। আশা করি আপনাদের এই দোয়া সবসময় পাবো।

মাহমুদুর রহমানের কথা বলেছে ড. তুহিন মালিক আমার আসলে যে কথাটা বলাতে আমার মনে পড়েছে। তিনি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু। তিনি দীর্ঘদিন জেলে আছেন অন্যায়ভাবে, অবৈধভাবে। তাঁর পত্রিকা বন্ধ করে রাখা হয়েছে কোনো বৈধ অভিযোগ ছাড়া। এটি পারে না। প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স আইন অনুসারে এটা তারা করতে পারে না। দিগন্ত টেলিভিশন বন্ধ, ইসলামিক টেলিভিশন বন্ধ। তুহিন এখনো পর্যন্ত যেতে পারে টেলিভিশনে। আমি টেলিভিশনে তো বহু আগেই নিষিদ্ধ। আমাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করার জন্যে আমার বাসার সামনে বসে ছিল। সব টেলিভিশনওয়ালারাসহ। মানে গণমাধ্যম এবং পুলিশসহ বসে আছে ফরহাদ মজহারকে কখন ধরা হয় এবং সেটাকে তারা দেখাতে পারবে। তো এর মধ্যে আমরা বেঁচে আছি।

ফলে আপনাদের যখন দেখি তখন সাংঘাতিক আনন্দ পাই, অভিভূত বোধ করি। মনে হয় যে আমরা একটু... কী করেছি? কিছুই করতে পারিনি। ইতোমধ্যে অল্প কিছু দুয়েকটা কথা হয়তো বলেছি কখনো। তাতেই আপনাদের এত ভালোবাসা দেখে সত্যি সত্যি নিজেকে সম্মানিত বোধ করি, অনেক সাহস বোধ করি। দেশে ফিরে গিয়ে যেন আমরা আরো কাজ করতে পারি, আপনাদের

এই ভালোবাসা নিয়ে। সেইটা আমরা অনুপ্রেরণা নিয়ে যাবো।

যেহেতু সময় কম, আমরা মূল কথাটার বিষয়ে দুয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো, যাতে আমরা...। আমি যেটি চিন্তা করছি যাতে আপনারা সেটা বুঝতে পারেন, আমার ভুল থাকলে ধরিয়ে দিতে পারেন, বলতে পারেন— সে ধরনের কিছু কথা বলবো।

আমি সাধারণত বলে থাকি যে লড়াইটা আমাদের দুটো স্তরে। একটা হচ্ছে: মুসলমান হিসেবে লড়াই, আমরা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, মজলুম। আমাদের ঈমান-আকীদার উপর আঘাত আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেটা মুসলিম দেশ, মুসলমানদের দেশ, তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হচ্ছে। তাদের উপর বোমাবাজি করা হচ্ছে। তাদেরকে স্টোন এইজে ফিরে যাওয়ার কথা বলে তাদের উপর হামলা করা হচ্ছে। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন থেকে 'ওয়ার অন টেরর' শুরু হয়েছে। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যে মজলুম জনগোষ্ঠী, তাদের নিজস্ব ব্যথা তারা বুঝবে। এবং সেই নিজস্ব কণ্ঠস্বরটা একটু আগে ড. তুহিন মালিকের কণ্ঠস্বরে শুনে গেছেন। এবং এই জালিম ব্যবস্থার মধ্যে শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা দুনিয়াতে তার বিরুদ্ধে মুসলমানরা লড়বেই, কোনো সন্দেহ নেই। এই লড়াইটা আছে।

কিন্তু আরেকটা স্তরের লড়াই আছে। এটাকে আমি বলি— ইসলামের লড়াই, ইসলাম কায়েম করার লড়াই। এটা এক জিনিস না। কারণ, ইসলাম একইসঙ্গে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে আসে নাই, সমগ্র মানবজাতির জন্যে এসেছে। আমি কি ঠিক বলেছি?

[উপস্থিত শ্রোতা সমস্বরে: ঠিক।]

আচ্ছা। যদি সমগ্র মানবজাতির জন্যে এসে থাকে, তাহলে তাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে হাজির করার মতো করে, আমাকে আমাদের কথাগুলো বলতে হবে। বলতে শিখতে হবে।

কারণ, যদি সে আমাকে চিহ্নিত করে যে আমি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে কথা বলতেছি, তাহলে দুনিয়াটা খ্রিষ্টান বনাম মুসলমানদের লড়াইয়ে পরিণত হয়ে যাবে। আমরা তাদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলি। যখনি তাদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেন, বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যায়, বাংলাদেশ ইরাক হয়ে যায়, বাংলাদেশ সিরিয়া হয়ে যায়, বাংলাদেশ লিবিয়া হয়ে যায়। আপনার কেউ চান?

[উপস্থিত শ্রোতা: না।]

কেউ এটা চান না। না যদি চাই, তাহলে আমাদেরকে যেভাবে ইসলামকে বুঝতে হবে, সেটা একটা দার্শনিক প্রস্তাবনা আকারে। আমার ঈমান-আকীদার জায়গা থেকে আমি মুসলমান, আমাকে মুসলমানী কায়দা আগে বুঝতে হবে। আর আমাকে, আরো... মানবজাতির জন্য তাকে হাজির যখন করবো, তখন তাকে আমাদেরকে দার্শনিক, সার্বজনীন সত্য আকারে হাজির করতে হবে।

এটা খ্রিশ্চিয়ানিটি এবং ... গ্রীক সিভিলাইজেশনকে আত্মস্থ করে খ্রীষ্টধর্ম এটা করতে পেরেছে, যাদের দেশে আপনারা বাস করেন। তাদের সংস্কৃতি নানাভাবে আপনাদের সন্তানদের, আপনাদের মধ্যে নানানভাবে এসে যাবে, এসে যাচ্ছে। এটাকে ঠেকাবার কোনো উপায় নেই। কারণ, আমরা যে জগতে বাস করি এই জগতটা ইসলামের জগত না। এটা গ্রীক-খ্রিষ্টজগত। চিন্তাভাবনার দিক থেকে, সবকিছুর দিক থেকে খ্রিষ্টিয় জগত। তার মধ্যে আমরা বাস করি।

তাইলে কী করে আমি বুঝবো? বুঝতে হবে যে ইসলামের দর্শনিক প্রস্তাবনাগুলো কী ছিল? মুসলমানের ঈমান-আকীদার কথা বলছি না। কারণ, আমার চেয়ে এখানে আমার ভাইয়েরা... সদরুদ্দিন ভাই এখানে আসছেন, অনেক আলেম-উলামা দেখতেছি, তারা আমার মুরুব্বি, তারা আমার চেয়ে অনেক ভালো জানেন। তাই এটা আমি দাবি করবো না। কিন্তু আমি যেটা চেষ্টা করবো বলতে, সেটা হলো— ক্ষুদ্র পড়াশোনায় আমি বুঝতে পারছি যে ইসলামের কতগুলো দার্শনিক প্রস্তাবনা আছে, যেটা গ্রীক-খ্রিষ্টীয় দর্শনের চেয়ে অনেক অগ্রসর।

[উপস্থিত শ্রোতা: ঠিক।]

কী করে বুঝবো আমি যে অগ্রসর? এটা তো খালি... আমি তো একটা খ্রিষ্টানের সাথে কথা বলতে বসি, একজন ভিন্ন ধর্মের লোকের সাথে কথা বলতে বসি। যদি বলি— কোরান শরীফে এটা আছে। ও তো বলতে পারে— তোমার কোরান শরীফ, আমার কী? আমি তো এগুলোর কথা বুঝবো না।

কিন্তু আমি যদি এটা বলি যে ইসলাম প্রথম, আজকে থেকে বহু বছর আগে, প্রায় পনেশ বছর হয়ে যাচ্ছে, বহু বছর আগে একটা কথা বলেছিল। যেটা আমরা আমাদের কানে ভালো করে বুঝিনি তখন। আমাদের নবী যখন কথাটা বলেছিলেন তখন ভালো করে বুঝতে পারি নাই। কথাটা ছিল এই যে “কোনো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কোনো ইহলৌকিক বস্তুর দ্বারা, কোনো

ইহলৌকিক সম্পত্তির দ্বারা হবে না।” এটা স্পিরিচুয়াল হতে হবে। এটা আধ্যাত্মিক হতে হবে। এটা দৈব হতে হবে। ইট মাস্ট বি মেডিয়েটেড বাই স্পিরিচুয়ালিটি। এটাকে রিডিউস করা যাবে না কোনো ইহলৌকিক জিনিসের মধ্যে। কারণ, আমরা যার ইবাদত করি তিনি এমন একটা সত্তা, যে সত্তাটা কোনো ইহলৌকিক বস্তুর মতন নয়। ইহলৌকিক বস্তু যেমন করে ‘আছে’ আছে — আমরা বলি না ঐ কাপটা আছে, ঐ বোতলটা আছে, আমি আছি? — উনি এরকম ‘আছে’ নন। এরকম না উনি। ভিন্ন জিনিস।

ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা হতে হবে এই ধরনের একটা ডিভিনিটি... এই ডিভাইন সম্পর্কের। সেখানে রক্তের সম্পর্ক থাকতে পারবে না, সেখানে জমির সম্পর্ক থাকতে পারবে না, সেখানে গোত্রের সম্পর্ক থাকতে পারবে না, সেখানে গোষ্ঠীর সম্পর্ক থাকতে পারবে না, সেখানে কোনো জাতীয়তাবাদ থাকতে পারবে না। ইসলাম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না।

[উপস্থিত শ্রোতা: ঠিক।]

তাহলে এই ভিত্তিতে কথাটা যখন আমি বলি, সে কীসে বিশ্বাস করে? সে সমগ্র মানবজাতিকে, যতই তার বিচিত্রতা এবং বিভিন্নতা থাকুক, তাকে সে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করে। এটাকে তার ভাষায় বলে ‘উম্মাহ’। আর আপনারা এটাকে বানিয়ে ফেলেছেন মুসলিম উম্মাহ! তো মুসলিম উম্মাহ বললে তো এর মধ্যে সাধারণ লোকেরা ঢুকবে না। ঢুকবে কী? যদি মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই তাহলে বলতে হবে যে আমার পলিটিক্যাল মিশন, আমার রাজনৈতিক মিশনটা হচ্ছে এই মানুষজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা।

এটা যখন... কথাটা এসেছিল বহুবছর আগে। যখন তর্কটা উঠল তখন নবীজী জেরুজালেম থেকে তার রুকু ফিরিয়ে দিলেন। তিনি চলে আসলেন ইব্রাহীমের মক্কার দিকে, তাঁর রুকু ফিরিয়ে দিলেন। কারণ, মানুষকে এক করতে চেয়ে। কারণ, আমরা মিল্লাতে ইব্রাহীম। আমাদের কাছে মুসাও নবী, আমাদের কাছে হযরত ঈসাও নবী, হযরত ইউনুসও নবী, হযরত দাউদও নবী। ... যে সবাইকে গ্রহণ করে তারচেয়ে সহনশীল ধর্ম কিছুই নাই। আমরা এসে কী বলি? ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলি— তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরচেয়ে মধুর সম্ভাষণ আর কী হতে পারে, বলেন? তাহলে আজকে নিজেকে প্রশ্ন করি আমরা: আমাদের কেন সন্ত্রাসী বলে অন্যরা? এটা কি আমাদের দোষ? নাকি তাদের দোষ?

[উপস্থিত শ্রোতা সমস্বরে: আমাদের দোষ।]

বাহ! যদি এতটুকু বুঝতে পারি তাহলে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারবো, যেটা আমাদের জন্য দরকার। অন্যদেরকে যদি দোষারোপ করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আগাতে পারবো না। আগানোর কোনো পথ নাই। কারণ, আমি তো পড়ি নাই কোরআন শরীফকে দর্শনের বই আকারে। কোরানকে আমরা পড়েছি আইনের বই আকারে। ঠিক কিনা বলুন?

আমি যদি আল্লাহর আইন বলি... না, কোরআন তো আল্লাহর আইন আকারে আসে নাই। শুধুমাত্র আল্লাহর আইন আকারে আসে নাই। ফোরকান বলি আমরা এটাকে। সত্য-মিথ্যাকে ভাগ করেছে বলি আমরা এটাকে। আল্লাহর আইন আকারে আসে নাই টেন কমান্ডমেন্টের মতো। এটা জুদাইজম। আইন আকারে এসেছে জুদাইজম, কোরআন আইন আকারে আসে নাই।

কোরআন আশেকানের কথা বলে এসেছে, মহব্বতের কথা বলে এসেছে, রহমানুর রাহীমের বাণী গ্রহণ করে এসেছে। উনি বলেন— দয়ালু, প্রভু ডাকো। অসুবিধা নাই। আগে ডাকছো। কিন্তু তুমি ডাকলে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ পড়বা। তাহলে আমরা কী বলি, বিসমিল্লাহ বলে শেষ করে দেই? ঐ essence তুমি ডাকবা, যে essence হচ্ছে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’। রাহমানুর রাহীম আকারে আমরা ডাকবো। আমার সুন্দর লাগে, মজা লাগে। তোমাকে জড়ায়ে ধরতে ভালো লাগে। তুমি যত অপরাধ করেছো তা মাফ করে দিতে ইচ্ছা করে। যেহেতু তুমি ‘রাহমানুর রাহিম’ বলবা। এই হচ্ছে ধর্ম।

তাহলে এটা দর্শনিক আকারে পড়ি নাই। এটা পড়েছি কীভাবে? শুধু ঈমান-আকীদার জায়গা থেকে পড়েছি। ঈমান-আকীদার জায়গা থেকে পড়তে হবে। কারণ, আমার সেই ঈমান-আকীদার ডিগনিটিটা আমাকে আহত করতেছে, কষ্ট দিচ্ছে বাংলাদেশে আমাদেরকে। আজকে বাংলাদেশে রাসূলের বিরুদ্ধে যেসব কথাগুলো লেখা হয়েছে ইন্টারনেটে, তরুণ ছেলেরা আধুনিকতার নামে। তাহলে এটা তো... তারা এই নতুন করে নাই। নবীর বিরুদ্ধে হেন কোনো কুৎসা নাই যে কুৎসা এই গ্রীক-খ্রিষ্ট সভ্যতা করেনি। আপনারা যদি বই পড়েন, ১০০টা বইয়ের মধ্যে ৯৯ বই কুৎসায় ভরা। সেই দেশে আপনারা বাস করেন।

তাহলে আমি কিন্তু এই কুৎসার জবাবটা দিতে পারবো, যদি আমি উন্নতভাবে দেখাতে পারি যে কোরান একই সঙ্গে দর্শনের গ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ না। খ্রিশ্চিয়ানিটির পারস্পেক্টিভটা বুঝেন। প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিশ্চিয়ানিটি কি ক্যাথলিকিজম বলেন, তারা

কিন্তু তাদের মতো করে কিন্তু আপনাকে খ্রীষ্টান বানায়া ফেলছে।

কেমনে বানাইছে? আপনি কি গণতন্ত্রের কথা বলেন না? বলেন তো। আপনি গণতন্ত্র চান— বলেন না? তাহলে গণতন্ত্রের ভিত্তিটা কী? গণতন্ত্রের দাবি হলো: মানুষ সভরেইন। মানুষ তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে। গণতন্ত্র বলে ব্যক্তি প্রধান, সমাজ গৌণ। ব্যক্তি আগে সমাজ পরে। আপনি বিশ্বাস করেন উল্টা। এটা কি ইসলামের রীতি? নাকি ইসলামে উল্টোটা? সমাজ আগে ব্যক্তি পরে?

আপনার জীবন কি আসলে ধর্ম দ্বারা চলে নাকি পুঁজির দ্বারা চলে— আপনি বুঝায়ে বলুন তো? তা যদি চাকরিতে না যান, আর যদি বেতন না পান, মজুরী না পান, খেতে পারবেন তো? যদি ব্যবসা না করেন আর মুনাফা না করেন, খেতে পারবেন? তো নিজেকে কীসের ভিত্তিতে মুসলমান বলেন? কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেন যে আপনি আসলে নবীর তরিকায়? তাহলে সে নবীকে মানেন। আপনি মুমিন। আপনি...

ইসলামের সাথে পুঁজিতন্ত্রের দ্বন্দ্ব একদম গোড়ায়। যারা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে না, তারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করতে পারে না। এর বিরুদ্ধে লড়াই যদি করতে হয়, একটা হচ্ছে তার সামাজিক-রাজনৈতিক লড়াই। কারণ ইসলাম এসেছে ধর্ম আকারে না, একটা রাজনৈতিক মিশন নিয়ে সে এসেছে। দুনিয়াকে বদলাবার মিশন নিয়ে এসেছে। যারা এটাকে শুধু থিওলজি বানিয়ে ফেলে, আমরা তাদের সাথে একমত না। তাদেরকে ভালোবাসবো আমরা, কিন্তু আমরা তাদের সাথে একমত না।

তাহলে, এই তোমরা পলিটিক্যাল ইসলাম কেন করো? তোমরা রাজনীতি করবা না। তোমরা শান্তিতে করো। তোমাদের মসজিদ-মাহফিল যত লাগে সব আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে দিয়ে দিবো। তোমাদের কত মসজিদ লাগবে? আমরা দিয়ে ফেলি...। দিচ্ছে কিন্তু তারা। তারা মসজিদ সমিতির নামে টাকা দিচ্ছে বাংলাদেশে। কোটি কোটি মিলিয়ন ডলার, স্টার্লিং, পাউন্ড যাচ্ছে বাংলাদেশে মসজিদ বানাবার জন্য। ভালো তো। আপনি নামায-কালাম পড়লেন পাঁচ ওয়াক্ত, অসুবিধা কী? আপনি তো এই সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন না। শান্তিতে আছেন, অসুবিধা কী? ওরা খুব চায় আমরা ভালো মুসলমান হয়ে যাই। আপনি যেন জঙ্গি না হোন, ভালো মুসলমান হয়ে যান— এটা খুব পছন্দ করে। তবে পলিটিক্যাল ইসলাম করবা না, এটা খুব খারাপ জিনিস!

আর আমি উল্টোটা বলি। আমি বলি— ইসলাম আসছেই রাজনীতি করার

জন্যে। তার আগেও নবীরা এসেছেন, তাঁদের অনুসারীরা তাঁদের কথা শুনে নাই, তাঁদের কথা বুঝে নাই। তখন তিনি এসে বললেন যে আমি এটা কায়েম করবো। 'কায়েম' কথাটা এটা পলিটিক্যাল। এটা পলিটিক্যাল পাওয়ার। এটা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের উপর নির্ভরশীল।

রাজনৈতিক ক্ষমতাটা প্রথমত আসে সংঘ শক্তি থেকে। এই যে আমরা এত রাত্রে এসে বসে আছি আমরা, কথা বলতেছি— এই শক্তি থেকে এটা আসে। এটা এক নাম্বার। দ্বিতীয়ত, এটা আসে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্যে চিন্তার বিকাশ, দার্শনিক বিকাশ, বিজ্ঞানের বিকাশ থেকে এই জিনিসটা আসে। আমার নিজের যে উপলব্ধি, আমি যেমনে করে পড়বো — আমার নিজের ধর্মগ্রন্থ বলি, আমার নিজের যে ঐতিহ্য আছে, যে ট্র্যাডিশন আছে — তাকে আমি পড়তে পারি কিনা ঠিক মতো, তাকে আমি বুঝতে পারি কিনা ঠিক মতো, তার উপরে আমার শক্তি নির্ভর করে।

ইসলামে এটার ভালো শব্দ আছে। এটাকে দুভাবে পড়তে পারেন আপনি। একটা ফিলোসফিক্যালিও পড়তে পারেন, আরেকটা রিলিজিয়াসলি পড়তে পারেন, মানে থিওলজিক্যলি পড়তে পারেন। শব্দটার নাম হলো 'শাহাদাহ'। অন্য কোনো ধর্মে কিন্তু এই সাক্ষ্য দেবার নিয়ম নাই। যে আপনি পারিবারিকভাবে, জন্মসূত্রে মুসলমান হয়েছেন; (কিন্তু) ইসলাম মনে করবে না আপনি মুসলমান। না, এটা পুরোটা হন নাই আপনি। আপনার মধ্যে শাহাদাহ এবং সাক্ষ্য দিতে পারছেন কিনা? আপনি কালেমা পড়লেন, আপনি নবীর উম্মত হয়ে যাবেন, অসুবিধা নাই। সেটা একটা জিনিস। কিন্তু আপনি উপলব্ধি করেছেন কিনা কোরআন নিয়ে? আপনি উপলব্ধি করেছেন কিনা নবী কাকে বলে? আপনি উপলব্ধি করেছেন কিনা আসলে ইসলামী জীবন বলতে কী বুঝায়?

এই কথাগুলো যদি আমি উপলব্ধি না করছি, আপনারা সাক্ষ্য দিতে না পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি সে স্তরে পৌঁছাতে পারতেছেন না। যাকে আরেকটা... সাধারণভাবে আমরা বলি 'মুমিন'। মুসলমান এবং মুমিনের মধ্যে পার্থক্য আকাশ এবং পাতাল। মুমিনের কাছে কোনো ধর্মই খারাপ না। মুমিনের কাছে কোনো সম্প্রদায়ই তার বিরোধী শক্তি না। মুমিন মানুষকে ভালোবাসে। সব মানুষকে ভালোবাসে। আল্লাহ কি কখনো দেখেছেন যে এই ব্যাটা হিন্দু বলে তার কাছে সূর্য বন্ধ করে দিব? এই! তুই আমারে মানিস না, তোরে তাই আজকে থেকে আর সূর্য দেব না! পানি বন্ধ করে দেব! এবং ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে রিজিকের উপর হাত দিতে পারবেন না। এটা তো আল্লাহর উপর খুদগারী হবে।

তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে আপনি শরীক করলেন। এটা কোন অধিকার নেই আপনার। আল্লাহ যাকে দেবে তার কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না।

এই যে দার্শনিক জায়গা, এই যে উপলব্ধির জায়গা। এই যে উপলব্ধি থেকে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে আমি তাকে বুঝেছি তিনি কী বলেছিলেন পনেরশ বছর আগে। ঐ উপলব্ধি যাতে আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমি জানি কী ওহী আকারে তার কাছে আসছিল। এটা আমি বুঝতে পেরেছি। এবং আজকে ২০১৪ সালে, সেই উপলব্ধির জায়গা থেকে আমি দুনিয়াতে ইসলাম কায়েম করবো— এইটা ভিন্ন জিনিস। মুসলমান হওয়ার চেয়ে এটা আলাদা, এক জিনিস না।

এটা খ্রিশ্চিয়ানিটি পেরেছে। অন্যান্য ধর্ম পেরেছে ওদের জায়গা থেকে ওরা। আমরা এখনো পারি নাই। ফলে আমাদের আজকে যেই পশ্চাৎপদতা দেখতেছি আমরা, পরাজিত হওয়া দেখতেছি, আজকে তারা যুদ্ধবিগ্রহ, বিদ্যা, সমস্ত কিছুতে আমাদের চেয়ে অগ্রসর হওয়া দেখেছি; তার সবচেয়ে বড় কারণটা হলো আমরা সত্যিকার অর্থে ইসলামের বাণী — যেটা আমাদের নবীজীর মাধ্যমে এসেছে আমাদের কাছে — এটাকে আমরা উপলব্ধি করি নাই। উপলব্ধি যখন করি নাই তাহলে সাক্ষ্য দিতে পারছি না। সাক্ষ্য যখন দিতে পারছি না তখন খ্রীষ্টানরা আমাদেরকে বিশ্বাস করে না।

“ও তো মুসলমানদের কথা বলে, নিজের স্বার্থের কথা বলে। ও টাকা-পয়সা করতে পারে নাই। বিজ্ঞান চর্চা করতে পারে নাই, দর্শন চর্চা করতে পারে নাই। সে এখনো মধ্যযুগে পড়ে আছে পনেরশ বছর আগে। তো এই জন্য সে নিজের কথা বলে। তো ওকে কিছু টাকা-পয়সা দিলে সে ঠিক হয়ে যাবে।”

তাই পারে কি না আমরা, বলেন? তৃতীয় বিশ্বে আমরা কী করি? আমরা নিজের পায়ে চলতে পারি? আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, সেখানে ৪২টা বছর চলে গেছে, এই ৪২ বছরে আমরা এখনো ভিক্ষুকের জাতি আকারে পরিগণিত। আপনারা এখান থেকে দেশে/গ্রামে, আপনাদের বাড়িতে টাকা পাঠান। আমরা গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠাই। তো সেই টাকাটা যখন গ্রামের বাড়িতে যায়, তারা আপনাদের টাকায় চলে। কিন্তু বাংলাদেশ তার নিজের পায়ে দাড়াতে পারে নাই। এটার চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। তাহলে এই জায়গাগুলো আমাদের বুঝতে হবে।

আমি দ্রুত বলবো, কারণ আমার সময় খুব কম। আমি দ্রুতই বলবো। পরে আপনাদের প্রশ্ন করবেন। হয়তো আমার লেখালেখি পড়েন। সেখান থেকে প্রশ্ন করতে অসুবিধা নাই নিশ্চয়। প্রশ্ন......

বাংলাদেশে ইসলামের প্রশ্নটা একই সঙ্গে কৃষকদের প্রশ্ন, বুঝতে হবে। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত এই দেশের মানুষ, উপমহাদেশের মানুষ ইংরেজি শিখে নাই। মনে আছে কি? ভুলে গেলেন নাকি ইতিহাসগুলো?

শিখছি তো? শিখছি তো ১৮৫৭ এর পরে। সিপাহী বিদ্রোহের পরে। মার খাবার পরে। যখন বুঝতে পারলেন মুঘল সাম্রাজ্য আর আসতেছে না, তখন তারা ইংরেজি শিখা শুরু করলো। তার আগেই অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়, তারা ইংরেজি শিখে আপনাদের চেয়ে আগায়া চলে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এসে গেছে, কলকাতা মৃত শহর হয়ে গেছে। এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে — মূলত রায়ত যারা, অধিকাংশ যারা কৃষক, তাদের কাছ থেকে — জমি নিয়ে চলে গেছে ইংরেজদের আইনের দ্বারা। এই যে দেশে বসে আছেন তাদের আইনের দ্বারা। যে দেশে আপনারা চলতেছেন, খাইতেছেন, আপনাদের রিজিক চলতেছে, আমি খারাপ বলতেছি না, থাকেন। আমি ১২ বছর, ১৫ বছর এমেরিকাতে ছিলাম। কিন্তু একদিন চলে গেছি। আমি বলছি, এই দেশ আমার দেশ না। হয় আমি বাংলাদেশ ঠিক করবো, আর না হলে এই দেশে থেকে আমার কোনো লাভ নাই।

তাইলে ওরা আইন করে, মুসলমানদের কাছ থেকে বা যারা কৃষক তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে চলে গেছে। সেই জমির অধিকারের জন্য লড়াই হয়েছে পরবর্তী দুইশটা বছর। এবং সেই জমি, লড়তে লড়তে তার জন্য পাকিস্তান হয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পরে আমরা — কবে? মনে আছে কিনা আপনাদের? — ১৯৫৩ সালে টেনেন্সি এ্যাক্ট হয়েছে। যেখানে জমিদারী প্রথা, মহাজনী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। এটা লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে হয়েছে। কারা লড়াই করেছিল? শেরে বাংলা ফজলুল হক লড়েছিলেন, কৃষকরা লড়াই করেছিলেন, সংগ্রাম করেছিলেন।

৫৩ সালের পরে, আমরা পরবর্তীকালে দেখলাম যে ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুরু হলো— যেটা আমরা ইতিহাসে দেখি। কিন্তু ইতিহাসও আমরা ঠিকমত পড়ি নাই। ভাষা আন্দোলন কি আসলে ভাষা আন্দোলন ছিল? ঠিক মতো পড়ি নাই তো আমরা। ভাষা আন্দোলন যদি ভাষা আন্দোলনই হয়, তাহলে ভাষা আন্দোলনে এই যে কুট্টি — যারা উর্দু ভাষায় কথা বলে — ওরা হাতের বালা খুলে দিছিল কী জন্য? যারা আব্দুল মতিন, ভাষা মতিনকে যারা চিনে তার কাছে গিয়ে এই গল্প আবার শোনেন। উর্দু স্পিকিং লোকরা ভাষা আন্দোলনের টাকা কী জন্যে দেবে? কারণ এই না...। বাঙালি জাতীয়াতবাদীরা সম্পূর্ণ ইতিহাসটা মুছে দিছে। আমাদের কাছে এটা... জানি না আমরা এখন আর। কেন দিছে? খুব সহজ কথা। পাকিস্তানে তারা চেয়েছিল... পাকিস্তানে... যে ১০০ বছরে তারা

ইংরেজি শিখতে পারে নাই, যেটাতে পিছিয়ে পড়েছে, তাদের যে আকাঙ্ক্ষা সে আকাঙ্ক্ষায় তাদের ছেলেদের পাঠাইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে মরিচ বিক্রি কইরা, পাট বিক্রি কইরা, ধান বিক্রি কইরা পাঠাচ্ছে। সেই ছাত্রকে আপনি গুলি করে মেরেছেন পাকিস্তানে। সংঘাতিক ব্যাপার এটা। সাংঘাতিক ব্যাপার যে কত কষ্ট সে পেয়েছে, যে আমি গত ১০০টা বছর পড়ি নাই। ইংরেজ দ্বারা নিগৃহীত দুইশ বছর আমি। আমার ছেলেকে আমি পাঠাইছি পড়তে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা পাঠাইছি। তুমি গুলি কইরা তুমি ঢাকা শহর রক্তাক্ত করে ছাড়ছো! এই পাকিস্তান কি আমি চেয়েছি? এই কৃষক এসে যুক্ত হলো। ঢাকা শহরে তারা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

তাহলে ওদের অর্ধেক ইতিহাস অর্ধেক। বাকি ইতিহাসটা আমরা জানি না। বাকি ইতিহাস আমরা পড়ি নাই। সেই বাকি ইতিহাস যখন আমরা পড়িই না, তখন হেফাজত যখন নামে রাস্তায়, তখন তাদেরকে আমরা পছন্দ করি না। ওরা, হেফাজতিরা, আইস্যা তো বিপদে ফালায়া দিলো আমাদেরকে। তো যে অতীতের ইতিহাসটা পড়িই নাই... ইংরেজদের... লড়ছি ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এদের কারণেই তো এই... আগে পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে, তারপরে বাংলাদেশে যোগ দিয়েছি। এদেরকে নিয়েই লড়েছি। এদের ইতিহাসটা কী তাহলে? কোথা থেকে আসছে? দেখতেছি না তো আমি। তবে আমাদেরকে এই ইতিহাস তৈরি করে নাই, বাংলাদেশকে মুক্ত করাটা পরের কথা।

শেষ কথাটা আমি যেটা বলবো, যেটা ড. তুহিন মালিক বলেছিলেন, আপনাদেরকে এটা তথ্য আকারে বলি। এটা মনে রাখবেন। যেটা একটু আগে আমি বলি...। সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী না, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি।

[উপস্থিত শ্রোতা সমস্বরে: ঠিইইইক।]

না, চেঁচালে হবে না। বুঝতে হবে কেন বলছি। চেঁচিয়ে আপনি রাজনীতি করতে পারবেন না। কোনো লাভ নাই। মূল কথায় আসতে হবে। এতে কিচ্ছু লাভ হবে না।

তাহলে প্রথম কথা হলো যে কেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তি? সংবিধানে যান। সংবিধান পড়বেন। পুরোনো, ৭২ সালের সংবিধান পড়বেন। তার আগে যান, একটা ঘোষণা আছে, যেটার নাম হল: প্রোক্লেমেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স, স্বাধীনতার ঘোষণা। স্বাধীনতার ঘোষণায় গিয়ে দেখবেন যে স্বাধীনতার ঘোষণা — যে ঘোষণার ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল — এটার তিনটা নীতি নিশ্চিতকরণার্থে লেখা আছে যে আমরা এই তিনটা নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন

করবো, তার ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ করছি। সেই তিনটি নীতি কী? বাঙালি জাতীয়তাবাদ নাকি? বলতে পারেন কি?

[উপস্থিত একজন: বৈদেশিক মুদ্রা...]

দেখছেন!

[অন্যরা: স্বনির্ভর বাংলাদেশ, অর্থনৈতিক মুক্তি...]

নো নো নো...। কেন ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলে অসুবিধা কী? ছিল তো তার মধ্যে। ছিল না? না, ছিল না। কী ছিল তার মধ্যে? পড়ে দেখবেন দয়া করে, প্লিজ। আমি করজোড়ে অনুনয় করছি, ইতিহাস পড়েন। সেখানে লেখা ছিল, প্রথম লেখা ছিল সাম্য। সাম্য কি ইসলামের আদর্শ নাকি ইসলামের আদর্শ নয়?

[উপস্থিত শ্রোতা: ইসলামী আদর্শ, অবশ্যই।]

সাম্য ইসলামী আদর্শ? আমরা জাত-পাত মানি? ইসলামে জাত-পাত আছে? নাই। তাহলে সাম্য আমাদের আদর্শ। তাহলে ঐ স্বাধীনতার ঘোষণার প্রথমে যা লিখেছিল, যে নীতি নিশ্চিত করবার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছি সেটার এক নম্বরে ছিল সাম্য। দুই নম্বর কী ছিল? বলতে পারবেন না? সমাজতন্ত্র নাকি?

[উপস্থিত শ্রোতা: না, গণতন্ত্র।]

তাই? না, আপনি ঠিক বলেন নাই। এই জায়গায় আমরা এতগুলা লোক বসে আছি...। যাবেন, স্বাধীনতার ঘোষণা পড়বেন আজকে। একটু হাত তোলেন যে রাত্রে গিয়ে আমি স্বাধীনতার ঘোষণা পড়বো। পড়েন। তাইলে দুই নম্বরে ছিল মানবিক মর্যাদা। মানবিক অধিকার না কেন? মর্যাদা কেন? কারণ, অধিকারটা ইসলামে নাই, যদি ব্যক্তি অধিকারের কথা বলি। ইসলাম সমষ্টিতে বিশ্বাস করে। সে ডিগনিটিতে বিশ্বাস করে, মর্যাদা। কেন? কারণ, মানুষ আল্লাহর খলিফা আকারে পৃথিবীতে আসছে।

[উপস্থিত শ্রোতা: ঠিক।]

মানুষ জীব না, জন্তু-জানোয়ার না। তাহলে তার মধ্যে... দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন সে। ... যদি মানুষকে জীব বলেন, তাহলে মানুষকে দাসও বানানো যায়। গ্রীক ফিলোসফির মূল কথাটা হইলো, মানুষ হলো... জীবের অতিরিক্ত যেটা ঐটা হলো মানুষ। তো জীবের অতিরিক্ত যদি কারো মধ্যে না থাকে, সে তো আর মানুষ না। তো তাকে তারা দাস বানাতে পারে। কিন্তু ইসলামে দাসব্যবস্থা নাই।

এজন্যে ইসলাম মানুষকে ডিভাইন... তার মধ্যে দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা আকারে সম্মান করে। এই বিষয়ে অধিকারের কথা বলে, সে মর্যাদার কথা বলে। এখানে পার্থক্য... তার সঙ্গে তফাৎটা কোথায়? আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমি যে ব্যাখ্যাটা করলাম এটা ইসলামী ব্যাখ্যা। আমরা লোকের সামনে ইসলাম লেখবার কোনো দরকার পড়ে না।

একটা শুড়িখানার সামনে... শুড়িখানার বাংলাতে বলি আমরা কি? আপনারা যেটা বার বলেন, এই তো? এখন শুড়িখানার সামনে যদি লেখেন 'ইসলামিক বার', এটা কি ইসলামিক বার হবে? হবে না। আচ্ছা, আর সত্যিকারের 'ইসলামিক' যেটা, তার সামনে কি ইসলাম লেখার দরকার আছে? তাহলে মানবিক মর্যাদা ইসলামের দর্শন। সাম্য ইসলামের দার্শনিক দিক।

তৃতীয় যে কথাটা ছিল স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যে সেটা ছিল: সামাজিক ন্যায়বিচার, সোশ্যাল জাস্টিস, বা ইসলামে আমরা যেটা বলি 'ইনসাফ'। এই তিনটা নীতির ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। তাহলে এই তিনটা নীতিতে কি আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে?

[উপস্থিত শ্রোতা: না।]

বাহ! এই তো আমার... হয়ে গেল। আপনি যে কোনো আওয়ামী লীগের লোকদের বলবেন যে ভাই, তুমি কি এই তিনটা নীতি বিশ্বাস করো? সে বলবে যে না। কী? আমি বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বাস করি, বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। সো, মুক্তিযুদ্ধ তো খারিজ হয়ে গেলো। আর তো দরকার নাই! আর কি দরকার আছে? তাহলে আমরা পড়তে জানতে হবে। আমাদেরকে জ্ঞানগতভাবে আরো অনেক উপরে উঠতে হবে।

তিনটা স্তরের লড়াই— আমার ব্যাখ্যা করার সময় নাই, আমাকে সময় শেষ হয়ে গেছে বলছে— তিনটা স্তরের লড়াই আমাদের খেয়াল করতে হবে বাংলাদেশে। একটা হচ্ছে আমাদের ঈমান-আকীদা রক্ষার লড়াই, যেটা আমাদের আলেম-ওলামারা করতেছেন।

আরেকটা স্তরে, আমাদের ন্যাশনালিজমের লড়াই, যেটা বিএনপি বা বিএনপি ভাবাপন্ন যেসব রাজনৈতিক নেতারা করছে। যে আমরা... একটা জাতীয়তাবাদী স্বার্থ আছে আমাদের। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বার্থ আছে। এটার লড়াই।

আর তৃতীয় হচ্ছে, মজলুমের লড়াই। ইসলাম মাত্রই মজলুমের ধর্ম। সে

মজলুমের পক্ষে, জালিমের পক্ষে না সে। আপনি যখনই জালিমের পক্ষে চলে যাবেন, আপনি নিজেকে আর মুসলমান দাবি করতে পারবেন না। তাহলে সে কারণে যারাই মজলুম, তাদের পক্ষে আপনাকে দাঁড়াতে হবে।

আজকে ইসলামী নেতাদেরকে আপনি অন্যায়ভাবে বিচারের নামে ফাঁসি দিচ্ছেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরী মুক্তিযোদ্ধা, বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা। কাদের মোল্লার কথা আপনারা শুনেছেন। তিনি বলেছেন যে এটা জুডিশিয়াল মার্ডার। এটা বিচারের নামে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তা আপনি যখন এটা করছেন একটা জাতির প্রতি, তাহলে বাংলাদেশ কোন জায়গায় আছে? আমি আর আপনাদেরকে তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কারণ, এটার প্রচুর তথ্য আছে। কথাটা হচ্ছে আপনার কি এ অবস্থা চান, নাকি এটা বদলাতে চান?

[উপস্থিত শ্রোতা: চাই।]

কী করে? আপনারা তো এখনো ইতিহাস পড়েন নাই। কেমনে বদলাবেন? তাহলে পড়তে হলে আমাদেরকে একত্র হতে হবে। আজকে আমি প্রশংসা করবো যে আমার ভাই মালেক, আজকে নজরুল ভাই আছে, ওদিকে আমার সদরুল ভাইয়েরা আছেন। তারা আপনাদেরকে এক জায়গায় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেছে।

আমাদের এই যে তিনটি ধারার যে লড়াই, এই তিনটি ধারার লড়াইয়ের লোকরা যেন এক জায়গায় থাকি। এই লড়াইটা যেন আমরা আগায়া নিয়ে যাই। কারণ, প্রথম কাজটা হইছে শেখ হাসিনাকে সরাইতে হবে যেমনে হোক।

[উপস্থিত শ্রোতা: ঠিইইইক।]

তাহলে আপনাদের... এই যারা বিদেশে আছেন আপনাদের অবদানটা অসাধারণ। বুঝবেন যে আপনারা অসাধ্য সাধন করতে পারেন, যদি একত্র থাকেন। এক। দ্বিতীয়ত, এই যে ছোট্ট কথাগুলো বলার সুযোগ হয়েছে আপনাদের সামনে এসে, যদি এটা বুঝতে পারেন, আমাদের লড়াইটা বুঝতে পারেন... এখনো পর্যন্ত আপনাদের এই লড়াইয়ের মধ্যে যারা মজলুমের পক্ষে রাজনীতি করে তাদেরকে এখনো দেখছি না। কারণ, তাদেরকে আপনারা নাস্তিক বলে গালিগালাজ করেন। আমি তাদের মধ্যে বহুদোষ আছে দেখতেছি। কিন্তু মাওলানা ভাষানীও তো মজলুমের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। উনিও তো ঐ পন্থী ছিলেন। ছিলেন কি না?

তাহলে যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা বুঝতে না পারবো যে জালিম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারাই লড়াই করে, তারা আমার মিত্র। এবং তাকে আমার এই যে সংঘ তৈরি করতেছে, এই সংঘের মধ্যে তাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে পতন করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। আর যদি আপনি সেটা না করেন, উনি চলে যেতে পারেন হয়তোবা, কিন্তু আবারও ফেরত আসবেন। ৭৫ সালের পরে ফেরত আসছে না, আসছে তো? তাহলে এটা আসবে। তো আমাদের কাজ অনেক বড়, অনেক গভীর।

আমি একটা বই লিখেছিলাম 'যুদ্ধ অনেক গভীর, অনেক দীর্ঘ'। যেদিন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসে, তারপর তিন বছর আমি অসুস্থ হয়েছিলাম। আমি লেখালেখি করতে পারি নাই। তো আমি বলেছি দীর্ঘ লড়াই। এই লড়াইটার কিছুই শুরু হয় নাই। কিছুই এখনো দেখেন নাই আপনারা। কিছুই দেখেন নাই দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে আমরা...। সময় নেই আজকে।

যদি বুঝতে পারি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বুঝতে পারি। বাংলাদেশ একটা ভয়াবহ বারুদের উপরে বসে আছে। এইখানে নেতৃত্ব দেওয়া, একত্রিত হওয়া, মানুষকে পথ দেখানো— এইটা শুধুমাত্র আমি মুসলমান, আমি এই, একটা বিরাট কিছু করে ফেলবো; এর দ্বারা কাজ হবে না। আমাকে বুঝতে হবে যে আমার লড়াইয়ের পদ্ধতি কী, রণনীতি কী, কৌশল কী হবে? ইসলাম আসলে কী? এই লড়াইটা যখনই বুঝতে পারবো, তখনই দেখবো যে সত্যিকার অর্থে, আমরা শুধু শেখ হাসিনাকে নয়, আমরা একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধেও আমরা লড়তে পারতেছি। তাদেরকে জবাব দিতে পারতেছি। ১৫০০ বছর আগে যে জবাবটা আমরা দিয়েছিলাম। গ্রীকদেরকে দিয়েছিলাম। খ্রিষ্টানদেরকে দিয়েছিলাম। রোমান এম্পেয়ারকে দিয়েছিলাম। বিভিন্ন রকম সাম্রাজ্যবাদকে আমরা দিয়েছিলাম। আমরা সেই লড়াইটা এই এখন, ২০১৪ সালে আবার শুরু করতে পারি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমার জন্যে আপনারা দোয়া করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।

** ২০১৪ সালের ১ ডিসেম্বর বৃটেনের ম্যানচেস্টারে ফরহাদ মজহারের বক্তব্যের রেকর্ডিং থেকে অনুলিখিত। লিংক: www.youtube.com/watch?v=vEWuVpSoNj0। ইউটিউবে এখন আর ভিডিওটি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ইউআরএলটি বর্তমানে অকার্যকর।* — ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২